করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি তাহার রুচি ও বিবেচনার সহিত কাঁধ মিলাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় 'যদি', ও 'কিনা', বিকীর্ণ করিয়া সিডিশন বাঁচাইব ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।

এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ দেশ সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দ্দশার অন্ত নাই। সত্যবাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি বা কেহ লেখে ছাপা ওয়ালা ছাপিতে চায় না,—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্য দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শতকোটী নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয় রাজ রোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্ক ভাষার ফাঁদে ফাঁদে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিক্ষত, বিকৃত মূর্ত্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্ব্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোস না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এত বড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কি আছে? যে ছেলে অবস্থার বশে ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার ফন্দি শিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দায়ে সিঁদ কাটিতে সুরু করে তখন তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করে তাহার মহত্ত্ব বাড়ে না এবং ইহার নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতায় দর্শকরূপে লোকের মনের মধ্যেও যেন সূচ বিঁধিতে থাকে।

দুই একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ করি আরও একটু পরিস্ফুট হইবে।

(ক্রমশঃ)

নারায়ণ

৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] [চৈত্র, ১৩২৮।

আলোর উদ্দেশে

[দরবেশ]

কোথায় আলো, কোথায় ওরে আলো!
ঘুচাও তোমার বর্ণেগন্ধে অন্ধকারের কালো
এই ভারতের দেশে দেশে,
মরণ-বরণ ঘুমের শেষে,
কণক কিরণ দেখাও হেসে,—
জীবন-জাগন ঢালো।
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিটোল ছন্দে
বাজাও তোমার বাঁশী;
ঘুমভাঙাদল নয়ন মেলে
খেলুক হাসি হাসি।
রঙীণ ডানার পরশ পেয়ে,
তরুণ প্রবীণ চলুক ধেয়ে;
পথের বিপুল আঁধার ছেয়ে
হোমের আগুন জ্বালো।

বাঙ্গলাভাষার ইতিহাস

[শ্রীহেমন্তকুমার সরকার]

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভাষা বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস।

(১) পাশ্চাত্য প্রদেশে ভাষা বিজ্ঞান চর্চা
(২) প্রাচ্য দেশে ভাষা বিজ্ঞান চর্চা
(পুরাতন ও আধুনিক)

বর্ত্তমান অধ্যায়ে আমরা ভারতীয় ভাষাসমূহ লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন সেই সকল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বলিব।

(১) ভাষা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা আধুনিক কালেই হইয়াছে। সেকালের ইউরোপে বৈজ্ঞানিক ভাবে ইহার চর্চা ছিল না বলিলেই হয়। গ্রীকজাতি ব্যাকরণের ধার ধারিত না। অলঙ্কার শাস্ত্রের চর্চা অবশ্য তাহারা খুব করিত। পরের ভাষা শিক্ষা করা তাহারা নিজেদের সম্মানের হানিকর বলিয়া মনে করিত। অন্য সকলের ভাষাই অসভ্য ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রথম গ্রীক ব্যাকরণ একজন রোমীয় কর্ত্তৃক লিখিত হয়।

ভাষাবিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরম্ভ হয়। ইংরেজ পণ্ডিতগণ এবিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক। কিন্তু জার্ম্মণরা সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর এবং এখনও পুরোবর্ত্তী আছে।

বপ্ (Bopp) নামক জার্মাণ পণ্ডিত তুলনামূলক ব্যাকরণের (comparative grammar) প্রথম রচয়িতা। তিনি ১৭৯১—১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সংস্কৃত, জৈন, গ্রীক, লাতিন, জর্মাণ, প্রভৃতি যাবতীয় ইন্দো—ইউরোপীয় ভাষার তুলনা মূলক ব্যাকরণ তিনিই লিখিয়া যান।

গ্রীম্ (Grimme, 1786—1859) আর একজন জার্মাণ পণ্ডিত তিনি ধ্বনিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি মূল সূত্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে আবিষ্কার করিয়া যান। সুবিখ্যাত Grimm's Law ইহারই আবিষ্কার।

পট্ (Pott, 1802—1887) নামে জার্মাণ পণ্ডিত অর্থ সম্বন্ধীয় আলোচনার সূত্রপাত করেন (Etymological Studies)।

ম্যাক্সমূলর (Maxmnller) যদিও বিলাতে বসবাস করিয়াছিলেন—কিন্তু জাতিতে তিনি জার্ম্মাণ ছিলেন।

ম্যাক্সমূলর ভাষাবিজ্ঞান চর্চ্চাকে লোকের মধ্যে বিস্তার করেন। তিনি এবং পাউল (Paul) নামক জার্মাণ পণ্ডিত "ভাষার ইতিহাস" (History of Language) অংশের আলোচনার জন্য খ্যাতি লাভ করেন।

শব্দার্থ তত্ত্বের (Semantics) আলোচনা আরম্ভের পূর্ব্বে হইলেও প্রকৃত পক্ষে ফরাসী অধ্যাপক ব্রেআল (Breal) ইহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetics) বিষয়ে গ্রিম, বার্ণার, গ্রাসমাণ, ফরচুনাটফ্ (Grinmm, Verner, Grassmann, Fortunatov) প্রভৃতি পণ্ডিতগণের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ফরচুনাটফ্ রুশীয় ছিলেন। ইহাঁরা ধ্বনিতত্ত্বের এক একটি সূত্র আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। গ্রিমের মূল সূত্রে যে সমস্ত দোষ ছিল, বার্ণার, গ্রাসমান, ফরচুনাটফ্ প্রভৃতি পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত সূত্রের সাহায্যে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায়। ব্যুলর (Biihler) নামক জার্মাণ পণ্ডিত ভারতীয় অক্ষরের ইতিহাস (Indian Paleography) রচনার জন্য অমর হইয়া গিয়াছেন। তুলনামূলক বাক্যবিন্যাসপদ্ধতির (comparative Syntax) আলোচনায় ডেলব্রুক (Delbriick) নামক আর একজন জার্মাণ পণ্ডিত শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। শুনিয়াছি অধ্যাপক ডেলব্রুকই একমাত্র লোক যিনি ঠিক নিজের মাতৃভাষার মতই অপর একটি ভাষায় দখল লাভ করিয়াছেন। সাধারণতঃ মাতৃভাষার মত অন্য ভাষার সমান অধিকার সম্ভবপর হয় না। তুলনামূলক বাক্যবিন্যাসপদ্ধতির আলোচনায় এরূপ জ্ঞান খুবই সাহায্যপ্রদ।

শব্দ সাহায্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস আলোচনায় জার্ম্মান পণ্ডিত শ্রাডার (Schrader) সবিশেষ প্রসিদ্ধ লাভ করিয়াছেন।

ভাষাবিজ্ঞান চর্চ্চার আগে অনেক গলদ ছিল। ইহাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর সর্ব্ব প্রথমে জর্ম্মাণির নব-বৈয়াকরণিকেরা প্রতিষ্ঠিত করেন। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকেরা উপহাস করিয়া ইহাঁদের নাম দেন Jimg, grammatikers —the Neo-grammarians অর্থাৎ "ছোক্‌রা বৈয়াকরণিকের দল"। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর লেসকিয়েন, থাইনটাল, পাউল, ব্রুগমান, ডেলব্রুক (Leskien, Steinthal, Paul, Brugmann, Delbriick) প্রভৃতি এই

দলের লোক প্রচার করেন অন্যান্য বিজ্ঞানের মত ধ্বনি বিজ্ঞানের সূত্রাদ কার্য্য করে। পূর্ব্বে সূত্র গুলির ব্যতিক্রম ব্যাখা না করিয়া গোঁজা মিল দেওয়া হইত। ইহাঁরা এমন ভাবে সূত্র গুলির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষায় একটী শব্দ এইরূপ হইলে গ্রীক ভাষায় এইরূপ ধ্বনি বিশিষ্ট হইবে—হইা বলা সম্ভবপর হইয়াছিল। হয় তো পরে গ্রীক ভাষায় ঐরূপ শব্দ হঠাৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং বৈজ্ঞানিকের বাণী সফল করিয়াছে।

ইন্দো-ইউরোপীয় ও দ্রাবিড়ী মূলভাষা হইতেই আমাদের ভারতীয় ভাষা-সমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। তাই এই দুই প্রধান বিভাগের আলোচনাকারী পণ্ডিতগণের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা সম্বন্ধে প্রধান বিশেষজ্ঞ জার্ম্মাণ পণ্ডিত ব্রুগমান এবং ফরাসী পণ্ডিত মেইয়ে (Meillet)। ব্রুগমান জীবিত বৈজ্ঞানিকগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভারত সংশ্লিষ্ট দুইটি প্রধান শাখার মধ্যে ইন্দো-ইরাণীয় ভাষায় গোল্ডনার, বার্থলোমাই ও জ্যাকসন (Goldner, Bartholomae, Jackson) বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গোল্ডনার ও বার্থ-লোমাই জার্ম্মাণ—জ্যাকসন্ আমেরিকান হইলেও জার্ম্মাণিতেই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন।

ইন্দো-ইউরোপীয়ের ভারতসংশ্লিষ্ট দ্বিতীয় প্রধান শাখার ইন্দো-আর্য্য ভাষা যাহা হইতে আমাদের সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ও বর্ত্তমান চলিত ভাষাসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। পিশেল, উলেনবেক্, স্পাইয়ার, টুম্, বাকারনাগেল, টমাস (Pischel, Speijer, Uhlenbeck, Thumb, Wackernagel. Thomas) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই শাখায় বিশেষ পারদর্শী।

বিম্‌স্, হ্যর্ণলে, গ্রিয়ারসন্, এণ্ডারসন প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ বাঙ্গলা ও তৎসংশ্লিষ্ট আধুনিক ভারতীয় ভাষার বিশেষভাবে বৈজ্ঞানিক চর্চ্চা করিয়াছেন।

দ্রাবিড়ী শাখা সম্বন্ধে ডাঃ কলডয়েল (Caldwell) ও শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার (Srinivas Aiyanger) মহোদয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য।

(২) প্রাচ্যদেশে ভাষাবিজ্ঞানের চর্চ্চা।

(ক) পুরাতন।

(খ) আধুনিক।

প্রাচ্যদেশ বলিতে এখানে আমাদের দৃষ্টি ভারতবর্ষের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রাখিব।

চীনদেশের কথা ছাড়িয়া দিলেও, আরব প্রদেশে অতি পুরাতন কাল হইতেই ভাষা বিজ্ঞানের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ হইতেই ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বেই যাস্ক বৈদিক সংস্কৃতের অর্থতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। তৎপরবর্ত্তী জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যাকরণ-রচয়িতা মহর্ষি পাণিনিকে ভাষাবিজ্ঞান জনক বলিলেও চলে কারণ তিনিই প্রথমে ধাতুবাদের (Theory of roots III. 1, 91) অবতারণা করিয়া যান। পরবর্ত্তী যুগেও শত শত বৈয়াকরণিক ভাষাতত্ত্বের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। শেষে নবদ্বীপের নব্য ন্যায়ের কূটতর্কের ভিতর ভাষাবিজ্ঞান জড়াইয়া মরে।

বর্ত্তমান কালে রামকৃষ্ণ গোবিন্দ ভাণ্ডারকর, পাণ্ডুরং দামোদর গুণে, ডাঃ ইরাক সোরাবজী তারাপুর ওয়ালা প্রভৃতি সুধীবর্গ ভারতীয় ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেকটা আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এখন বাঙ্গলা ভাষার বৈজ্ঞানিক আলোচনা যাঁহারা করিয়াছেন তাঁহাদের কথা বলিব। শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের History of the Bengali Language (বাঙলা ভাষার ইতিহাস) বাঙলা ভাষাতত্ত্ব বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ।

সখ করিয়া যাঁহারা বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথঠাকুর, যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়গণের নাম উল্লেখযোগ্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি অত্যুজ্জ্বল রত্ন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের কতকগুলি লেখাও অবধানযোগ্য।

বৈজ্ঞানিকভাবে যাঁহারা বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন তাহাদিগের মধ্যে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম সর্ব্বাগ্রে করিতে হয়। তিনি বাঙলাভাষার ধ্বনিতত্ত্বের দিকেই বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। বাঙলা-ভাষার ঐতিহাসিক ব্যাকরণ লিখিবার চেষ্টায় মৌলভী মোহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় হাত দিয়াছেন।

বাঙলাঅক্ষরের ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রীযুত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একখানি চমৎকার পুস্তক রচনা করিয়াছেন। শব্দার্থ তত্ত্বের আলোচনায় বর্ত্তমান লেখক হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন মাত্র। প্রাগৈতিহাসিক যুগসম্বন্ধে বাঙলাভাষাতত্ত্বের আলোচনা এখনও পর্য্যন্ত কেহ করেন নাই।

দুঃখের বিষয় বিদেশের পণ্ডিতগণ আমাদের ভাষার আলোচনা লইয়া জীবনপাত করিতেছেন, আর আমাদের দেশের সুধীবর্গের এদিকে মোটেই দৃষ্টি নাই। জ্ঞানের জননী ভারতের সন্তান আজ মাতৃভাষার আলোচনার জন্যও পরমুখাপেক্ষী এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কি আছে। এ লজ্জাভাণ্ডার সূত্রপাত হইয়াছে, আশা করি অচিরে এদিকে আমাদের দৃষ্টি পড়িবে।

অন্নপূর্ণা

[শ্রীসুনীতি দেবী]

(১)

যখন বৃদ্ধ রামতনু ভট্টাচার্য্য তদীয় একমাত্র দুহিতার বিবাহের ভাবনায় সর্ব্বদাই চিন্তাকুল, এমনি সময় একদিন তাঁহার বাল্যবন্ধু জমিদার কালীপদ মুখোপাধ্যায় অকস্মাৎ আসিয়া উপস্থিত। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতুলালয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের বাড়ীর নিকটে ছিল। এখন মাত্র কয়েকটা ছাড়া ভিটা ভিন্ন তথায় আর কিছুই নাই। পুত্রহীন মাতামহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্রীপুরে আসা যাওয়া ক্ষান্ত হইয়াছিল। প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে তিনি আজ তথায় আসিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার আজ কত প্রভেদ। তথাপি জমিদারমহাশয় বাল্যসৌহার্দ্দ্য স্মরণ করিয়া জমিদারীর তত্ত্বাবধান করিয়া ফিরিবার সময় ভট্টাচার্য্যের গৃহে অতিথি হইলেন।

ভট্টাচার্য্য প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই দেখিয়া কালীপদ বলিলেন, "কি ভায়া, তোমার কালীপদকে কি একেবারে ভুলে গে'ছ?"

ভট্টাচার্য্য জমিদার মহাশয়কে চিনিতে পারিয়া, মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া "আসুন" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কালীবাবু সহাস্যে বলিলেন, 'আসুন' কি ভাই? আমাকে 'আপনি' বল কেন; আজ ছোট বেলার মত দুজনে একসঙ্গে বসিয়া নুন লঙ্কা দিয়া ভাত খাব, এই আশায় এ পথে আসিয়াছি। তোমার সেই কালু ভিন্ন যদি আমাকে আর কিছু ভাব, তবে আমি এই বেলাতেই প্রস্থান করি।" ভট্টাচার্য্য দেখিলেন, এ সেই কালুই বটে!

পরিধান বস্ত্রাদিও যে ভট্টাচার্য্যের অপেক্ষা বড় ভাল, তা নয়; তবে পরিষ্কার বটে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তখন মেয়েকে ডাকিলেন, "অন্নপূর্ণা।" অন্নপূর্ণা তাড়াতাড়ি আসিতে গিয়া নূতন লোক দেখিয়া একটু সঙ্কুচিত হইল। কালীবাবু বলিলেন, "এস মা, এস। লজ্জা কিসের?, আজ অন্নপূর্ণার রাঁধা অন্ন খাইতে আসিয়াছি।" ভট্টাচার্য্য বলিলেন, "মা, তাড়াতাড়ি রান্না করগে। আমার বন্ধু এখানে খাবেন।"

অন্নপূর্ণা রান্নার যোগাড় করিতে গেল। গাছের বেগুন, লাউ ইত্যাদি তুলিয়া সুক্ত, ঘণ্ট, ভাজা, দা'ল প্রভৃতি খুব শীঘ্র পাক করিয়া পিতাকে ডাকিল। দুই বন্ধু একত্র ভোজনে বসিলেন। কালীবাবু বলিলেন, "ভাই, আজ যেন বাস্তবিক অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়াছেন। এমন রান্না তো বাড়ীতে কখনো খাইনে। ভেবেছিলাম নুন-লঙ্কা দিয়ে ভাত খেয়ে যা'ব। তা' মা যে রান্না করেছেন, একটুও পাতে রাখা হ'বে না। কিন্তু ভাই, আমার একটা কথা, —এ মেয়েটি আমাকে দিতে হবে, রোজ রাঁধবার জন্যে। এ রান্না খেয়ে পাচকের রান্না রুচ্‌বে না কিন্তু।" রামতনু প্রথমে ভাবিলেন ঠাট্টা। পরে যখন কালীবাবু বলিলেন, "আমার ছেলে সতীশ বি-এ পড়িতেছে। তাহাকে লইয়া আমি মাঘ মাসে আসিয়া তোমার মেয়েকে লইয়া যাইব।" তখন ভগবদ্ভক্ত ব্রাহ্মণ আনন্দোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "মা, সবই তোমার ইচ্ছা! তুমি যে ভার দিয়েছ, তুমিই তাহা হইতে পরিত্রাণ করিবে। তোমাকে ভুলিয়া যাই, তাই এত ভাবনা।" কালীবাবু অন্নপূর্ণাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিলেন, "ভাই, বিবাহের আয়োজন কর; এই পৌষ মাসান্তে মা আমার গৃহে যাইবেন।"

(২)

জমিদার গৃহিণী তরকারি কুটিতেছেন, এমন সময়ে পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "মা, কর্ত্তা আসিয়াছেন।" গৃহিণী তাড়াতাড়ি উঠিতেছেন, এমন সময় কর্ত্তা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "উঠতে হ'বে না, বস। একটা শুভ খবর আছে।" গৃহিণী সোৎসুক চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি খবর?"

কর্ত্তা। সতীশের বিয়ে স্থির করেছি।

গৃহিণী। কোথায়? কত টাকা দেবে?

কর্ত্তা। বাঃ! আগেই টাকার কথা? তোমার কি অভাব আছে নাকি? বিশ হাজার টাকার উপরে তোমার জমিদারীর আয়, তবুও—

গৃহিণী। তা বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে কি, টাকা না নিলে লোকে বল্‌বে ছেলের কি খুঁত আছে। তাই বিনে টাকায় বিয়ে দিল। তা' কিছুতেই হ'বে না। সে দিন রামের মা আমাকে বলিতেছিল, "দিদি, তোমার ছেলের একখানা পাশের দাম, দু'হাজার টাকা।" টাকা দিতে বলিও।

কর্ত্তা। টাকা দেবে কোত্থেকে? তাদের অবস্থা তো তেমন নয়। সেকি টাকা দিতে পারে?

গৃহিণী। না, দীন-দরিদ্রের মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না। ভাল টাকাই না দিল, বড় লোকের মেয়ে হ'লেও ত হ'ত। লোকে বলিবে কি?

কর্ত্তা। আমি সব স্থির করিয়া আসিয়াছি, আর বকাবকি করিও না। বিবাহের যোগাড় করগে।

ইহা বলিয়া কর্ত্তা উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী তো রাগে দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "যেমন কপাল, তেমনই ঘটে। কর্ত্তার যে কি বুদ্ধি হইয়াছে,—মান-অপমান জ্ঞানও নাই!"

(৩)

দশ দিন হইল অন্নপূর্ণার বিবাহ হইয়াছে। শ্বশ্রূ বৌ দেখিয়া খুসী হন নাই। দরিদ্রের মেয়ে, একখানা গহনামাত্র দেয় নাই। সে সব দুঃখ তো আছেই। ফুলশয্যার দিন কালীবাবুর অত্যন্ত জ্বর হয়, আজ অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, কবিরাজ বলিয়াছে রাত্রি কাটিবে না। গৃহিণী দিনরাত্র বালিকাবধূর প্রতি রোষাগ্নি বর্ষণ করিতেছেন। অন্নপূর্ণা কেবলই কাঁদে। শৈশবে মাতৃহীনা হইয়া যাঁহার স্নেহে প্রতিপালিতা হইয়াছে, যাঁহাকে ছাড়া সংসারে সে আর কাহাকেও জানিত না, সেই পিতার বিচ্ছেদ তাহার প্রাণে অত্যন্ত লাগিয়াছিল। গৃহিণী কঠোর স্বরে বলিলেন, "দিনরাত্রি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অমঙ্গল ডাকিয়া আনিও না। এমন অপয়া মেয়েওতো দেখি নাই। ঘরে আসিতেই আমার সংসার ভাঙ্গিবার যো হইয়াছে।" বালিকা ভয়ে ভয়ে চুপ করিত বটে, কিন্তু চোখের জল বারণ মানিতে চাহিত না।

দাসী আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা বৌমাকে ডাকিতেছেন।" এবং অন্নপূর্ণাকে সঙ্গে করিয়া কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল। বৃদ্ধ অন্নপূর্ণাকে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, দাসী চলিয়া গেল। এবার পরিষ্কার কণ্ঠে কালীবাবু ডাকিলেন, "সতীশ।" সতীশ পাশের ঘরে ছিল, ডাকিবামাত্র পিতার নিকট উপস্থিত

হইল। বৃদ্ধ বলিলেন, "সতীশ, তোমাদের উভয়কে একত্র দেখিব, তাই ডাকিয়াছি। মা অন্নপূর্ণা, নরম নরম হাত দুখানি কপালে বুলাইয়া দেও তো মা।" অন্নপূর্ণা হাত বুলাইতে লাগিল। বৃদ্ধ সতীশকে বলিতে লাগিলেন, "বড় লক্ষ্মী মেয়ে ঘরে আনিয়াছিলাম। দুঃখ এই, ভাল করিয়া দেখিতেও পারিলাম না। মা আমার আজন্ম দুঃখের ক্রোড়ে প্রতিপালিতা, সাধ ছিল মাকে মনের মতন সাজাইব, স্নেহের অভাব ঘুচাইব, অন্নপূর্ণা আমার গৃহে অন্নপূর্ণারূপে বিরাজ করিবেন। আমি দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব। সে সাধ পূরিল না, আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি চলিলাম। আমার আশা, তোমরা মায়ের দুঃখ ঘুচাইবে। আর এক কথা। পিতামাতা কিম্বা যে কোন গুরুজনই হউক না, কাহারও আদেশে ন্যায়ের পথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে, এ কথা স্মরণ রাখিও। তোমার মাকে এখন একবার আসিতে বল।" কথা শেষ না হইতে গৃহিণী সে ঘরে ঢুকিলেন। কর্ত্তা বলিলেন, "আমার দিন ফুরাইয়াছে, আমি চলিলাম, অন্নপূর্ণার মাতার অভাব তুমি ঘুচাইও। সতীশ তোমার আজ্ঞাধীন ছেলে, যেন তাহাকে এমন কোন আদেশ করিও না যাহাতে তাহাকে ন্যায় পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া বৃদ্ধ অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া একটু জল চাহিলেন। সতীশ মুখে বেদানার রস দিতে গেলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "আর ওসব কেন, গঙ্গাজল দেও।" সতীশ গঙ্গাজল দিয়া একবার ডাক্তার বাবুকে ডাকিতে গেলেন। এই ৭।৮ দিনের পর আজ বেশ জ্ঞান হইয়াছে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ শেষবার জ্বলিয়া এখনই হয়তো নিবিয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় সতীশের মন অত্যন্ত ব্যাকুল। কিন্তু গৃহিণী ভাবিলেন, বুঝি অবস্থা ভাল হইয়াছে। ডাক্তার প্রভৃতি অনেক লোক গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া গৃহিণী বধূকে লইয়া সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সকলেরই চক্ষে জল, কর্ত্তার ব্যবহারে সকলেরই তাঁহার প্রতি অগাধ ভক্তি ছিল। কর্ত্তা সকলকে বলিলেন, "আমাকে যাত্রা করাও, ভগবানের নাম শুনাও, আর দেরী নাই।" সতীশ সাশ্রু চক্ষে পিতার ললাটে বক্ষে গঙ্গামৃত্তিকায় রামনাম লিখিয়া দিলেন। শিবদৃষ্টি দেখিয়া গৃহের বাহিরে আনিয়া তারাব্রহ্ম রামনাম শুনাইতে লাগিলেন। সজ্ঞানে ভগবানের নাম শুনিতে শুনিতে ধার্ম্মিকবরের প্রাণবায়ু অনন্তে মিশিয়া গেল।

(৪)

যখন রামতনু ভট্টাচার্য্য অন্নপূর্ণাকে নিতে আসিলেন, মনে মনে কত আশা

অন্নপূর্ণা কত আদরে, কত উৎসবের মধ্যে দিন কাটাইতেছে! আহা! মেয়ে কখনও কোন উৎসব বা সুখের মুখ দেখে নাই। নিতান্ত ভগবান্ দয়া করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন! হয়তো যাইয়া দেখিবেন, অন্নপূর্ণা যেমন করিয়া পিতার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিত, তেমনি ভাবে কালীবাবুর সঙ্গে কথা কহিতেছে। তাঁহার স্নেহে হয়তো সে পিতার অভাব অনুভব করিতে পারিতেছে না, ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে ব্রাহ্মণ জমিদার বাড়ী প্রবেশ করিলেন।

কিন্তু ব্রাহ্মণ তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, কোন উৎসব বা আনন্দের চিহ্নমাত্র নাই, সকলেরই মুখে বিষাদের ছায়া। রামতনু জিজ্ঞাসা করিলেন, কর্ত্তা কোথায়? শুনিলেন আজ দুই দিন হইল তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন, হায়! অন্নপূর্ণার জন্য বুঝি ভগবান্ আদর যত্ন লেখেন নাই! পরে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সমস্ত বাড়ীটাই যেন শোকে মুহ্যমান। সতীশের মুখে তাঁহার হৃদয়ের অব্যক্ত যাতনা যেন প্রকাশিত হইতেছে।

রামতনু বেহানকে কহিলেন, "আমি না জানিয়া অন্নপূর্ণাকে নিতে আসিয়াছি। তা' এ অবস্থায় আর কেমন করিয়া লইয়া যাইব। বেহাই এত শীঘ্র যে তোমাদের শোক সাগরে ভাসাইয়া চলিয়া যাইবেন, ইহা স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই।" সতীশ বিশেষ কিছু বলিল না। রামতনুর আহারাদির ব্যবস্থা অন্য ব্রাহ্মণ বাড়ীতে করা হইল; অশৌচ, এ জন্য এ গৃহে তাঁহার আহার করা হইবে না।

সতীশের মার কিন্তু অন্নপূর্ণাকে রাখিতে সাহস হইতেছে না। এমন অপয়া মেয়ে, গৃহে আসিতেই ত শ্বশুর গত হইয়াছেন। সতীশের যদি উহার গায়ের বাতাসে কোন অমঙ্গল হয়? ভাগ্যি এ যাবৎ তাহার সতীশের সংস্পর্শ ঘটে নাই! তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন, "আপনি আপনার মেয়েকে লইয়া যান, এমন ডাইনী মেয়েকে রাখিতে আমার সাহস হয় না।" কালীবাবুর অভাবে, এ বাড়ীতে যে অন্নপূর্ণার কি রকম আদর, ব্রাহ্মণের তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। যাহা হউক, ভগ্ন হৃদয়ে কন্যাকে লইয়া তিনি তথা হইতে যাত্রা করিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শ্বশুর গৃহ হইতে অন্নপূর্ণার অন্ন উঠিল।

(৫)

দুই তিন দিন পরে সংবাদ আসিল, রামতনু ভট্টাচার্য্যের মৃত দেহ পাওয়া

গিয়াছে, সম্ভবতঃ নৌকা-ডুবি হইয়াছিল। মেয়েটার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এ সংবাদ সকলেই শুনিল।

রামের মা আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, "দিদি, শুনিলাম, বৌটার বাপের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সম্ভবতঃ সে-ও মরিয়াছে। বলিলে কি বল্‌ব দিদি, সেই মরা ত মরিল, আর কিছুদিন আগে মো'লে হয়তো তোমার এ সর্ব্বনাশ হইত না।" গৃহিণী নীরবে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিলেন। রামের মা বলিতে লাগিলেন, "তা তোমার দুঃখ হতে পারে, তোমার দয়ার শরীর কিনা। আমি কিন্তু দেখিয়াই বলিয়াছি মেয়েটার লক্ষণ তত ভাল নয়। অত ছোট কপাল কি ভাল হয়? আমার মেয়ের কপাল খানা দেখিয়া সে দিন গণক ঠাকুর কত ভাল বলিলেন, যেমন বড় উঁচু কপাল তেমনি বড় ও উঁচু ঘরের বৌ হ'বে। আমি বলেছিলাম, তেমন বেশী টাকা তো নাই যে বড় ঘরে বে হ'বে। গণক বলিল, এই জমিদার বাড়ীতেই বিবাহ হওয়া সম্ভব। তখন অসম্ভব ভাবিয়াছিলাম, এখন দেখছি ভগবানের ইচ্ছায় সম্ভব হইতেও পারে। কর্ত্তা তো বিনে টাকায় আমার চেয়েও দরিদ্রের ঘরের মেয়ে এনেছিলেন।"

গৃহিণী কোন উত্তর করিলেন না। ইতিমধ্যে বাটীর একটি পরিচারিকা সেখানে আসিয়াছিল। বৌয়ের জল-মগ্ন সংবাদ শুনিয়া বলিল, "অমন বৌ কিন্তু আর জুটিবে না। যখন গহনাগুলি ও বেনারসী পরাইয়া দিয়াছিলেন, যেন দুর্গা-প্রতিমার মতই দেখাইতেছিল। উঠানখানি যেন আলো করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আহা! কথাগুলিও যেন"—

পরিচারিকার কথায় বাধা দিয়া রামের মা বলিলেন, "ওর মত সুন্দর মেয়ে ঢের মিলবে। বড় ফ্যাকাশে রং যেন চোখ ধরে। আমার মেয়েকে দেখিয়া অনেকেই বলে, মেয়ে-মানুষের এমন বর্ণই ভাল! বেশ লক্ষ্মীর শ্রী।" গৃহিনীকে অপেক্ষাকৃত অনুচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি গহনাগুলি কি সব দিয়াছিলে?" গৃহিণী কহিলেন, "আমি ভাবিলাম এ ক'দিন তো আর গহনা পর্‌বে না। তাদের ভাঙ্গা ঘরে চোরে লইয়া যাইবে, তাই সঙ্গে দিই নাই। তখন তো ভেবেছিলাম' আবার এই খানেই আস্‌তে হবে। এমন যে হ'বে তা কে জানত। কেবল কর্ত্তা সতীশ ও বৌয়ের জন্যে এক-রকম নূতন ফ্যাসানের আংটী গড়িয়েছিলেন, সেই আংটীটা ছিল।" রামের মা বলিলেন, "তা ভালই করেছিলে, দিদি। বৌতো গিয়াছে, গয়নাগুলোও যেত। সেও পরত না, তোমারও জিনিষ নষ্ট হ'ত।"

এমন সময় কর্ম্মচারী আসিয়া ডাকিল, "গিন্নী মা, এদিকে আসুন, কথা আছে।" গৃহিনী উঠিয়া গেলেন।

মহা সমারোহে কর্ত্তার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গিয়াছে। সকলেই একবাক্যে বলিতে লাগিল, তিনি যেমন সদাশয় লোক ছিলেন, তাঁহার কার্য্যও তেমনি সুন্দরভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। কাঙ্গালীরা দুইহাত তুলিয়া সতীশচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল। পণ্ডিতেরা বলিলেন সতীশ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হইয়াছে। সকল কাজ সম্পন্ন হইয়া গেলে সতীশ মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া কলিকাতা রওনা হইলেন।

(৬)

সতীশ কলিকাতায় পৌঁছিয়া তাঁহার বন্ধু বিনোদলালের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন। পিতৃশোকে মন যেন বড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মানসিক অবসাদ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইবার আশায়, বিনোদের আসার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই তাহার বাসায় গেলেন।

বিনোদ হাসিয়া বলিলেন, "কি ভায়া, এবার ফিরিতে পারিলে তো? আমি তো ভাবিয়াছিলাম, বৌদিদি বুঝি আর তোমাকে এ যাত্রা ছাড়িয়া দিবেন না।" বিনোদ বিবাহ পর্য্যন্ত জানিত। তৎপরে যে সব ঘটনা ঘটিয়াছে, সে সব কিছুই জানিত না।

সতীশ তখন সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বিনোদলালকে বলিলেন। তৎপর কহিলেন, "ভাই, যেদিন আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব এ জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে এক মুহূর্ত্তও যেন শান্তি পাইতেছি না। প্রাণের কি যে হাহাকার করিতেছে, তাহা মানুষকে বলিয়া বুঝাইতে পারি না। যিনি অন্তর্য্যামী তিনি ভিন্ন আর কেহ এ প্রাণের যাতনা বুঝিবে না। হৃদয় ভার অসহ্য বোধ হইতেছিল, তাই এখানে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে তোমার নিকট আসিয়াছি। তুমি আমার পরম অন্তরঙ্গ বন্ধু। তোমাকে দেখিয়া তোমার কাছে দুঃখের কথা বলিয়া, প্রাণে একটু শান্তিবোধ হইতেছে।"

বিনোদ সতীশের কথাগুলি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, "তোমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার অন্য কোন কথা-বার্ত্তা হইয়াছে কি? তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবে কি?"

সতীশ কহিলেন, "কথা বলিবার সুযোগ আর ঘটিল কৈ? ফুলশয্যার রাত্রে যখন শুইতে গেলাম, চাকর আসিয়া বলিল কর্ত্তা ডাকিতেছেন। গিয়া

দেখিলাম, বাবার ভয়ানক জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিয়া, তাঁহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া, তাঁহার সামান্য পরিচর্য্যা করিতে লাগিলাম। অনেক রাত্রে যখন তাঁহার একটু ঘুম হইল, তখন তিনি বলিলেন, 'তুমি এখনও শোও নাই? যাও, আমি এখন একটু ভাল আছি।' তাহার পর শয্যায় গিয়া দেখিলাম, অন্নপূর্ণা ঘুমাইতেছে। তাহার ঘুমন্ত মুখখানি যেন ফুটন্ত পদ্মফুলের মত শোভা পাইতেছে। তাহাকে আর ডাকিলাম না। পরে তাঁহার সে মুখখানি আর দেখি নাই। বাবার ব্যারামেই ব্যস্ত ছিলাম, আগেতো আর জানি নাই যে এই শেষ দেখা!"

বিনোদ বলিল, "মনে কর যদি ভবিষ্যতে কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাও, তবে কি চিনিতে পারিবে? তাঁহার শরীরে বিশেষ কোন চিহ্ন আছে?"

সতীশ বলিলেন, "যদিও আমি দেখি নাই, তবু যতটুকু দেখিয়াছি, আমার সমস্ত মন প্রাণ দিয়া দেখিয়াছি। দেখি যদি, চিনিতে পারিব বৈকি? তাহার ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে একটী তিল আছে। কিন্তু আর কি তাহাকে ফিরিয়া পাইব? জানি না, যদি বাঁচিয়া থাকে, তবে কি ভাবে আছে। 'সে যে আজন্ম দুঃখের কোলে প্রতিপালিতা'—বাবার এই কথাটি কেবলই যেন আমার প্রাণে বাজিতেছে!"

বিনোদ বলিলেন, "ভগবানের কৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, আবার দেখা হইতে পারে। কিন্তু তাহাকে খুঁজিতে হইবে।"

সতীশ বলিলেন, "আমিও তাহাই ভাবিতেছি।"

(৭)

এই ঘটনার পর চারি বৎসর গত হইয়াছে। ৺কাশীধাম বিশ্বেশ্বরের দর্শনমানসে এক রুগ্ন ব্রাহ্মণ অনেক চেষ্টা করিয়াও মন্দিরে ঢুকিতে পারিতেছেন না। পরে অতিকষ্টে কোনরূপে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন করিয়া যেমন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছেন, অমনি কতকগুলি লোক তাহার উপর যাইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ সকাতরে বলিতে লাগিলেন, "মা অন্নপূর্ণা কোথায় তুই? তোর ভরসায় আমি যে এত কষ্টেও এখানে আসিয়াছি।"

একজন বিদ্রূপ-স্বরে বলিলেন, "অন্নপূর্ণা যেন তোমাকে কোলে করিয়া তুলিবেন!" এমন সময়ে সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণারূপিণী দেবী মূর্ত্তি কোথা হইতে আসিয়া বাস্তবিক ব্রাহ্মণকে কোলে করিয়া তুলিয়া লইলেন। একজন প্রবীন বয়সের লোক ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে

অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "আপনার বাসা কোথায় বলুন। আমি আপনাকে পৌঁছাইয়া দিতেছি।"

তৎপর তিনি ব্রাহ্মণের সমভিব্যহারে তাঁহার বাসায় চলিলেন।

ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের নাম কি ?"

"শশীভূষণ মিত্র।"

"এখানেই থাকেন ?"

"না, দুই-তিন দিন মাত্র আসিয়াছি। মুঙ্গেরে ওকালতি করি।"

"আপনি সদাশয় বলিয়া মনে হইতেছে। আর পাঁচ দিন পরে আপনি দয়া করিয়া একবার এখানে আসিবেন। বিশেষ কথা আছে।"

"আমার সঙ্গে ?"

"হাঁ।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ব্রাহ্মণকে নমস্কার করিয়া চলিয়া গেলেন।

বৃদ্ধ অন্নপূর্ণাকে বলিলেন, "মা আর সপ্তাহ মধ্যে আমার জীব-লীলা সাঙ্গ হইবে। তাই ভাবিতেছি, তোমাকে কাহার কাছে রাখিয়া যাইব! যিনি রক্ষা করিবার তিনি রাখিবেন;—মানুষ উপলক্ষ মাত্র। কাহাকেও চিনিতাম না। এই ভদ্রলোকটিকে ভগবান্ যথাসময়ে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি ভাবিতেছি, তোমাকে উঁহার কাছে রাখিয়া যাইব। বিন্দুমাত্র ভীত হইও না। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন। তোমার দুঃখের দিন শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর অল্পদিন পরে তুমি অভীষ্ট বস্তু লাভ করিবে। মা, তোমাকে পাইয়া সন্তানের সকল অভাব ভুলিয়াছিলাম। তুমি মায়ের মত যত্ন করিতে, সন্তানের মত ভক্তি করিতে। ভগবানের কৃপায় আর মাসখানেক পরে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে।"

অন্নপূর্ণা নীরব রহিল। অশ্রুধারা তাহার গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া যেন শিশির-সিক্ত পদ্মফুলের মত তাহার সৌভাগ্য বিস্তার করিতেছিল।

ব্রাহ্মণ আবার কহিলেন, "মা, কাঁদিও না, তুমি গীতা পড়িয়াছ, ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর। অনন্ত জীবনের তুলনায় এ ক্ষুদ্র জীবন কতটুকু? সুখ-দুঃখ যাহাই আসুক না, কিছুতেই দৃক্‌পাত না করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া, তাঁহাতেই হৃদয়-মন সমর্পণ কর;—ধীরে ধীরে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হও। নিজেকে নিরাশ্রয়া মনে করিও না। যাহাকে দেখিবার কেহই নাই, তাহাকে

তিনিই দেখেন।—তাঁহাকে ভুলিও না। এইবার তোমার দুঃখের চরম। এই শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে, তাঁহার মঙ্গলহস্ত দেখিতে পাইবে।"

ঠিক পাঁচ দিন পরেই শশীভূষণ মিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "দয়াময় ভগবান্ আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আমার এ জীবনের আর দুদিন মাত্র বাকী আছে। দু'দিন পরে এ দেহের সম্বন্ধ ঘুচিবে। এ মেয়েটিকে কোথায় কাহার কাছে রাখিয়া যাইব ভাবিতেছিলাম, এমন সময় ভগবান্ আপনাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

মিত্র মহাশয় বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ইঁহাকে আমি মেয়ের মতই মনে করিব।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন, "ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন।"

(ক্রমশঃ)

(দ্বিতীয় প্রবন্ধ)

তত্ত্বসমাসের সংক্ষিপ্ত সার

[শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্ত]

কোনো এক ব্রাহ্মণ সংসার জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া শান্তি কামনা করিয়া মহর্ষি কপিলের শরণাপন্ন হইয়া বলেন—'মহর্ষি সংসারের ত্রিবিধ তাপে আমি নিতান্তই তপ্ত, কি করিলে এই দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইব? শান্তির সন্ধান কোন পথে আমায় দয়া করিয়া বলিয়া দিন।" কপিলমুনি দয়া পরবশ হইয়া বলিলেন, "প্রকৃতি পুরুষের বিবেকাহ্বানেই মুক্তি—অন্য পন্থা নাই। মৎকথিত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের হৃদয়ঙ্গম হইলেই বিবেকজ্ঞান হইবে; শ্রবণ কর—।"

তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি প্রকার—

১। অব্যক্ত প্রকৃতি ২। অষ্টবিধ বুদ্ধি বা মহৎ। ৩। ত্রিবিধ অহংকার

৪-৮ পঞ্চতন্মাত্রা ৯-২৪ ষোড়শ বিকার যথা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মন পঞ্চভূত। ২৫। পুরুষ—ত্রৈগুণ্য। শংকর। প্রতিশংকর। অধ্যাত্ম। অধিভূত অধিদৈবত। পঞ্চ অভিবুদ্ধি। পঞ্চ কর্ম্মযোনি। পঞ্চবায়ু। অবিদ্যা। অসক্তি, অতুষ্টি, অসিদ্ধি। তুষ্টি। সিদ্ধি। মুলিকার্থ অনুগ্রহসর্গ। ভূতসর্গ। বন্ধ। মোক্ষ। প্রমান। দুঃখ।

তত্ত্ব ব্যাখ্যা।

১। প্রকৃতি—অব্যক্ত unmanifested ঘট পটাদি ব্যক্ত। **লক্ষণ** অনাদি এক অবিচ্ছিন্ন, অশ্রুত, অস্পর্শ, অনশ্বর, অনন্ত, অগন্ধ, অপরিণামী, সূক্ষ্ম, নির্গুণ, অপ্রসূত। প্রসবী ; সর্ব্বসাধারণ।

অপর সংজ্ঞা—প্রধান ; ব্রহ্মন ; পুর ; ঋব; অক্ষর, ক্ষেত্র, তমস্, প্রসূতি।

২। বুদ্ধি—অধ্যবসায়। ইহা নয় উহা নয় বিচার বৃত্তি। ইহার অষ্ট প্রকার যথা—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য—আসক্তি ; ঐশ্বর্য্য, অসক্তি। প্রথম চারি প্রকার হইল বুদ্ধির সাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। শেষ চারি প্রকার তামসিক অভিব্যক্তি।

বুদ্ধির অপর সংজ্ঞা—মন, মতি, মহৎ, ব্রহ্মা, খ্যাতি, প্রজ্ঞা, শ্রুতি, ধৃতি ; প্রজ্ঞান সন্ততি ; স্মৃতি, ধী।

৩। অহংকার অভিমান (self-consciousness) বিজ্ঞান বা প্রত্যয়ের (perceptive object বা mental state.) সহিত আত্মার একত্ববোধ, আমি ইহা, আমি উহা, আমার ইহা, আমার উহা ইত্যাদি।

অহংকারের বিবিধ প্রকার—(১) বৈকারিক—সত্বপ্রধান ভাল কাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক।

(২) তৈজস্ রজপ্রধান, মন্দকাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৩) ভূতাদি—তমপ্রধান—গুণ্ডকাজ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৪) সানুমান—অজ্ঞাতভাবে ভাল করিবার প্রবৃত্তি জনক—

(৫) নিরনুমান—অজ্ঞাতভাবে মন্দ করিবার প্রবৃত্তি জনক—

এই পাচ প্রকার অহংকার বিধা—ভালমন্দ কাজের প্রবর্ত্তক।

cosmic creation এর সঙ্গে ইহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই।

(৪) পঞ্চতন্মাত্রা—অহংকার হইতে উৎপন্ন। জ্ঞানমাত্র, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রূপজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞান—বিবিধ প্রকার জ্ঞানের মূল ভাব মাত্র

essence of percptions। **সংজ্ঞা** (ক) **অবিশেষ** অর্থাৎ undifferentiated শব্দ মাত্র, কিরূপ বা কিসের বা কি মাত্রার এ সব বোধ রহিত।

(খ) মহাভূত ভূতের আদিরূপ। (গ) অনু (ঘ) অশান্ত (ঙ) অঘোর (চ) অমূঢ়। এই সব নামের অর্থ বোধ হয় এই যে প্রত্যয় মাত্র essence of perception এখনো জীবের মনে নানা ভাব (সুখদুঃখাদি) আনিতে পারে না। যথা শব্দের মাধুর্য্য আছে, কর্কশত্ব আছে, তীব্রত্ব আছে এবং সেই অনুসারে প্রেয় বা হেয় ; কিন্তু প্রথম অবিশেষ জ্ঞানে শিশুর আদি চেতনায় উহার কোনো ভাবান্তর ঘটাইতে এখনো পারে না। জীব এই অবস্থায় (অতি শৈশবে) অনুভূতির ভালমন্দ হেয় প্রেয় বিচার করিতে পারে নাই ; কাজেই উহারা বন্ধনের কারণ হয় না, এই অর্থ না বুঝিলে অঘোর, 'অমূঢ়' 'অশান্ত' এসব সংজ্ঞার সার্থকতা দেখিনা। অব্যক্ত হইতে তন্মাত্রা পর্য্যন্ত এই অষ্ট প্রকৃতি এখনো প্রকৃতি নামে উক্ত, কেননা উহারাই কেবল 'প্রকুর্ব্বন্তি' প্রসবকারী—অর্থাৎ পরবর্ত্তী বিকার প্রসু সুতরাং সংসার সৃষ্টি আদি তত্ত্ব।

ষোড়শ বিকার।

দশ ইন্দ্রিয় মন ও পঞ্চভূত এই সকল ১৬ বিকার। শিশুর যত চেতনায়-বিশেষত্ব differentiation ঘটিতে থাকে ততই বহির্জগৎ বোধ বাড়িতে থাকে। রূপরস শব্দাদির প্রত্যয় যখন হয় তখন কোথা হইতে হয়, কি উপায়ে হয় কোন যন্ত্রে এই বোধ ঘটে কিছুই বুঝিতে পারে না। প্রথম বুদ্ধিসঞ্চারে এই মাত্র হয় চেতনা ও তাহাতে প্রতিফলিত অনুভূতি ; শব্দ হইল, গন্ধ আসিল, রূপ জাগিল এই পর্য্যন্ত কার চেতনা, কি শব্দ, কার শব্দ কোথা হইতে, কি ভাবে অনুভূত কিছু না ; পরে অহংকার অভিব্যক্তি। diffused impersonal চেতনা পরিণত হইল আমার চেতনা ; আমি এক, অনুভূতি বা প্রত্যয় অন্য ; subject ও object বোধ। কাজেই অহংকারকে Subjectivation বলা যায়। তারপর generic শব্দ, generic রূপ, ইত্যাদি। উহাদের বিভিন্নতার বোধ তখনো নাই বা বাহির হইতে জড়াঘাতে বা স্পন্দনে যে এইসব অনুভূতি তাও মনে হয় না। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আভব্যক্তির সঙ্গে এই জড়ও বাহির বোধ হয়। প্রথম নিজ দেহের স্থানবিশেষের দ্বারা অনুভূতি জ্ঞান হয়। চোখ দিয়া দেখিতেছি, কান দিয়া শুনিতেছি, নাকদিয়া শুঁকিতেছি এই সব জ্ঞান হয়

অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের localisation হয়। শব্দ হইলে শিশু কান ফিরায়, রূপ জাগিলে চোখ খোলে, হেয় রূপ হইলে চোখ বোজে ;:হেয় স্পর্শ হইলে অঙ্গ সংকুচিত করে। তারপর কর্ম্মেন্দ্রিয় বোধ। কথা কয়, হাত নাড়ে, পা নাড়ে ইত্যাদি। হেয় বস্তুর নিকট হইতে পলায়, প্রেয়বস্তু চায়, ইচ্ছা প্রকাশ করে ইত্যাদি :কর্ম্মেন্দ্রিয়ের চালনায় হেয় বর্জ্জন ও প্রেয় অর্জ্জন করিতে শিখে। মন একাদশ ইন্দ্রিয় ইহা কতক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কাজ করে, কতক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কার্য্য করে ; মনের কাজ সংশয় করা, বিচার করা, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা, বিজ্ঞানগুলিকে সংযোগ করতঃ বিষয় জ্ঞানে পরিণত করা ইত্যাদি।

সব শেষে জড় পঞ্চভূতের অনুভূতি ; ক্ষিতি, অপ্, তেজ মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চভূত। 'ভূত-বিশেষ' অপর সংজ্ঞা। অন্যান্য সংজ্ঞা যথা———বিকার, আকৃতি, বিগ্রহ, শান্ত, ঘোর, মূঢ়। তন্মাত্রা যখন সবিশেষ ভাবে localised হয় তখন ভূতের জ্ঞান হয়। Objeetified sensationকে ভূত বলা যায়। বাহিরের জড়জগতের ধারণা পঞ্চভূতের জ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং এই সকল যখন আবার সুখ দুঃখ ; আশক্তি বিরক্তি ; হেয় প্রেয় ; কাম্য, অকাম্য বিবিধ মনোভাবের States of consciousness সঙ্গে identified হয় তখনি জীবের পূর্ণ সংসার জ্ঞান হয়।

তারপর **পুরুষতত্ত্ব——পুরুষ** চেতনরূপী আত্মা ; উহার লক্ষণ সূক্ষ্ম, বিভু, চেতনাযুক্ত ; নির্গুণ, বিশুদ্ধ, অনাদি, অনন্ত, দ্রষ্টা, কর্ত্তা, ভোক্তা অপ্রসবী। পুরাণাৎ এই হেতু পুরুষনাম। দেহী। পুরে কিনা দেহে ক্ষেত্রে শয়তে এই অর্থে পুরুষ। সংখ্যা শাস্ত্রে পুরুষ জীবস্থ অনুআত্মা বহু, (monads) পুরুষের সংজ্ঞা—আত্মা, পুমান, ক্ষেত্রজ্ঞ ; নর, কবিব্রহ্মন, অক্ষর, প্রাণ, 'যঃকঃ' সৎ।

স্বরূপে পুরুষ কর্ত্তা নয় ; কর্ত্তা হইলে শুধু ভাল কাজই করিত ; গুণত্রয়ভেদে প্রকৃতিই কার্য্যশীলা ; সত্বপ্রভাবে ভাল, রাজপ্রভাবে মন্দ, তমপ্রভাবে মূঢ় কাজ প্রকৃতিরই ধর্ম্ম। পুরুষ এক নয় বহু, এই জন্য জীবভেদে পুরুষ নানাভাবে ভাবিত, নানা ভোগের ভোক্তা ; কেহ দুঃখী কেহ সুখী, কেহ জ্ঞানী, কেহ মূঢ় ; যেমন গুণময় দেহের বা প্রকৃতির সহিত যুক্ত। পুরুষ বেদান্তমতে এক হইলে একজীব সুখী হইলে সকলে সুখী হইত। কিন্তু তাহা দেখা যায় না। কিন্তু সাংখ্যের পুরুষ পূর্ব্বে যে সব লক্ষণে লক্ষিত হইয়াছে তাহাতে তাহাকে 'এক' অখণ্ড, বিশুদ্ধ গুণাতীত বিভু বলিয়া মনে হয়; তবে আবার পুরুষ বহু এ বিরোধী উক্তি কেন ? আমার মনে হয় দেহী পুরুষ অর্থাৎ যিনি প্রকৃতি সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত

হইয়া 'ভূতাত্মা' নামে অভিহিত, সেই পুরুষই বহু ; কেন না ভিন্ন প্রকৃতিযুক্ত দেহের দেহী হওয়াতে তাহার প্রতীয়মান বহুত্ব ঘটিয়াছে। বিবেক জ্ঞানবলে মুক্ত হইলে তো সব পুরুষ সমধর্ম্মা হইয়া যান ! বেদান্তের উপাধিযুক্ত জীবাত্মাই সাংখ্যের প্রকৃতি সম্বন্ধ দেহী পুরুষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রবন্ধে যে মৈত্রায়ণী উপনিষদের উক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় দর্শনশাস্ত্রের আধুনিক রূপ লাভের বহু পূর্ব্বে সাংখ্য বেদান্ত মতদ্বয়ের মধ্যে মূল বক্তব্যে বড় বিরোধ ছিল না ; ভাব একই ভাষা বা সংজ্ঞাই যেন আলাদা। কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়ণী উপনিষদে এইরূপ উভয় সাদৃশ্যের অনেক উক্তি আছে।

এই যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের পরিচয় দেওয়া হইল ইহাতে তত্ত্বসমাসকার বুঝাইলেন পুরুষ বা আত্মা ও প্রকৃতি স্ব স্বতন্ত্র হইলেও উভয়ের সংযোগ ফলে এই প্রত্যয়াত্মক empirical জগৎ এবং প্রকৃতির স্বভাবজ গুণত্রয়ের তারতম্যে ও তদ্‌প্রভাবে এই সংসার। Thesis, antithesis ও Synthesis যাবতীয় moral ও physical qualities দিয়া (প্রকৃতি) জগৎকে **হেয়+প্রেয় রূপ দিয়া** সংসারে পরিণত করিয়াছে। অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত বিকৃতির অধোগতি হইল সাংখ্যেয় শংকর (Evolution) এবং পশ্চাৎগতি হইল প্রতি শংকর বা Involution। তত্ত্বজ্ঞানী ইহা জানিলে দুঃখের কবল হইতে মুক্ত হন।

তারপর অধ্যাত্ম, অধিভূত ও অধিদৈবত বিচার। তত্ত্বসমাসকার দৃষ্টান্ত-যোগে ইহাদের পরিচয় দিয়াছেন। যথা—

বুদ্ধি অধ্যাত্ম (Subjective)
বস্তু বা বিষয় অধিভূত (objective)
ব্রহ্মা—অধিদৈবত (Dety)
চক্ষু—অধ্যাত্ম
দৃষ্টবস্তু—অধিভূত
সূর্য্য—অধিদৈবত
নাসা—অধ্যাত্ম
গন্ধদ্রব্য—অধিভূত
পৃথিবী-- অধিদৈবত ইত্যাদি

এই কথা তিনটির আসল মানে বোধ হয় এই যে—জ্ঞানব্যাপারে জ্ঞাতা

ও জ্ঞেয় চাই ; no subject without object, no objeet without subject এবং অধিদৈবত হইল এই উভয়ের সংযোগ ঘটনকারী সূক্ষ্ম-কারণ-রূপী আর এক শক্তি। শুধু চেতনা ও শুধু বস্তু থাকিলেই জ্ঞান হয় না; বস্তুর অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আর একটী শক্তি চাই যাহা এই সংযোগ ঘটাইবে। চোখ আছে, দ্রব্যও আছে, কিন্তু আলোকরশ্মি না থাকিলে দৃষ্টি জ্ঞান হইবে না। আত্মচৈতন্য ও অচেতন জড় উভয়ের মধ্য যে মারাত্মক ভেদ তাহাতে একের উপর অপরের ক্রিয়া কেমন করিয়া হইবে? একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অপরটী ঘোর জড় কাজেই তৃতীয় একটি শক্তি যাহা সূক্ষ্মকারণ রূপে অনুভূতি ব্যাপার ঘটাইতে পারে তাহার প্রয়োজন ; উহাই অধিদৈবত স্থানীয়। অবশ্য ঠিক বুঝান গেল না ব্যাপারটা কি। গীতায় অধিদৈবত বলা হইয়াছে জড়ের অভ্যন্তরস্থ কারণরূপী সূক্ষ্মপুরুষকে। জীবের চিত্তে যে জড় অনুভূতি হয় তাহা কি করিয়া ঘটে, উভয়ে যখন এত বিপরীত ধর্ম্মী? তাই বোধ হয় এই অধি-দৈবতের অবতারণা। জীবের অন্তরে অন্তর্য্যামী আত্মা আছেন, জড়ের অন্তরেও কুটস্থরূপে আত্মা আছেন ; উভয় আত্মাই একই পরমাত্মার অংশ বলিয়া উভয়ের স্বধর্ম্মত্ব ফলে এই অনুভূতি ব্যাপার ঘটে। like affects like।

অতঃপর অভিবুদ্ধি বিচার। অভিবুদ্ধি পাঁচ প্রকারের—যথা—ব্যবসায়, অভিমান, ইচ্ছা, কর্ত্তব্যতা, ক্রিয়া। ইহা করিতে হইবে—আমি করিব—এই করিব—তদুদ্দেশে ইন্দ্রিয় নিয়োগ—কার্য্যসম্পাদন ইতি। হেয় প্রেয় কি ইহা নির্দ্ধারণ করিয়া সংসারী জীব হেয়কে বর্জ্জন ও প্রেয়কে অর্জ্জন করিতে যে সব সঙ্কল্প ও চেষ্টা করে তাহারই বিবিধ stage হইল অভিবুদ্ধি।

অতঃপর কর্ম্মযোনি :—যে সব মানসিক প্রবৃত্তির উত্তেজনায় জীব সংসারে ভালমন্দ কর্ম্ম কার্য্য করিয়া বসে তাহাদের নাম কর্ম্মযোনি :—(ক) ধৃতি অপেক্ষা (খ) শ্রদ্ধা faith (গ) সুখ (ঘ) অবিবিদিষা carelessness (ঙ) বিবিদিষা (জ্ঞানেচ্ছা)। ইহাদের কতকগুলি প্রেরণা জাগায়, কতক গুলি উত্তেজনা জাগায় ; অবিবিদিষা ভুল কাজ করায়।

অতঃপর বায়ু-বিচার। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু। এই বায়ুতত্ত্বে সাংখ্যকার বলিতে চান জীব যে কর্ম্ম করে তার ইচ্ছা, চেষ্টা, উদ্দেশ্য, প্রেরণা আসে মন ও বুদ্ধি হইতে। এইটী কর্ম্মের psychological element ; তা ছাড়া উহার একটা physilogical element আছে তো।

কেবল ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য থাকিলেই তো কাজ হয় না, কর্ম্মেন্দ্রিয় চালনা দরকার বটে। এই যে শারীরিক ক্রিয়া হয় ইহা কতকগুলা vital function বটে এবং vital nervous energy প্রাণশক্তি এই সব কাজ সম্পাদনার্থ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চালায়। বায়ু এই vital energy এক একটি বায়ুর এক একটা sphere of action ক্রিয়াস্থান আছে। প্রাণবায়ু মুখ নাককে চালায়। অপান নাভি দেশকে ক্রিয়াশীল করে। সমান অন্তঃকরণকে চালায়। উদানবায়ু কণ্ঠনালীর চালক। ব্যান সর্ব্বদেহের চালক। আচার্য্য মোক্ষমূলর বলেন এই বায়ু কথাটার ঠিক যে কি অর্থ তা স্থির হয় নাই। তিনি বায়ুকে wind বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। অথচ ঠিক কথাটী vital spirit নিজেই আন্দাজ করিয়া এবং ঠিক অর্থ বুঝিয়াও তবু ইহার সত্যতার সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ; তিনি বায়ুতত্ত্বের original অর্থ খুঁজিয়া পান নাই আক্ষেপ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁর যে পূর্ব্বাপর সংস্কার যে আদিম সাংখ্যমত cosmic creation এর ব্যাখ্যা করিয়াছে ; psychological সংসার সৃষ্টিই যে কপিলের প্রধান প্রতিপাদ্য ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে নারাজ। এ অর্থ তাঁর মতে অর্ব্বাচীন সাংখ্য-বাদীদের স্বকপোলকল্পিত। এই ভ্রান্ত সংস্কার জন্যে তিনি অধিকাংশ তত্ত্বের ব্যাখ্যার গোলে পড়িয়াছেন। যেখানে cosmic creation মতকে গোঁজা দিয়া মিলাইতে পারিয়াছেন সেখানে তাহা করিয়াছেন ; যেখানে পারেন নাই সেখানে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

অতঃপর কর্ম্মাত্মা-তত্ত্ব বিচার :—কর্ম্মাত্মা কি না ego as active ; কর্ম্মকারী-আত্মা। ইহারা পঞ্চবিধ ; যথা—(ক) বৈকারিক (খ) তৈজস (গ) ভূতাদি (ঘ) সানুমান (ঙ) নিরনুমান—অস্যার্থ :—বৈকারিক কর্ম্মাত্মা শুভকার্য্যের কারক ; তৈজস কর্ম্মাত্মা মন্দকার্য্যকারী ; ভূতাদি তামস-কার্য্যকারী (hidden acts)। সানুমান কর্ম্মাত্মা সজ্ঞানে শুভকারী ; নির-নুমান কর্ম্মাত্মা, অজ্ঞানে মন্দকারী। অর্থাৎ অভিমানী দেহী, জীবাত্মারা পাঁচ প্রকার দেখা যায়। একশ্রেণী ভালই কাজ করে, একশ্রেণী নিষ্ঠুর পীড়াদায়ক কাজ করে ; একশ্রেণী জঘন্য মন্দকাজ করে ; একশ্রেণী না জানিয়া মন্দ করে, একশ্রেণী জানিয়া ভাল করে। দৃষ্টান্ত—দাতা দীনপালকরা বৈকারিক কর্ম্মাত্মা দেশজয়ী বীররা তৈজস কর্ম্মাত্মা ; চোর ডাকাত নরঘাতকরা ভূতাদি কর্ম্মাত্মা।

অতঃপর অবিদ্যা বিচার :—অবিদ্যা বা অজ্ঞান যথা—(ক) তমস (খ) মোহ (গ) মহামোহ (ঘ) তমিস্রা (ঙ) অন্ধতমিস্রা। তম ও

মোহ প্রত্যেকে অষ্টবিধ। মায়ামোহ দশ প্রকার। তমিস্রা ও অতমিস্রা প্রতেকে অষ্টাদশ প্রকার। তমোর ফল দেহাত্মবোধ। যোগলব্ধ বিভূতির গর্ব্বফলে **মোহ** অবিদ্যা। **মহামোহ** মুক্তি সম্বন্ধে ভ্রমজ্ঞান তমিস্রা অষ্ট-সিদ্ধির প্রতি প্রকাশ্য হিংসার ফল। অষ্টসিদ্ধি লাভের পর মরণকালীন যে দুঃসহ দুঃখাবস্থা তাহাই **অন্ধতমিস্রা**।

অতঃপর **অসক্তি** দুর্ব্বলতা তত্ত্ব বিচার :—

অসক্তি ২৮ প্রকার। একাদশ ইন্দ্রিয়ের ১১ দোষ ও বুদ্ধির ১৭ দোষ। অন্ধতা, মূকতা, বধিরতা ইত্যাদি খঞ্জতা, পঙ্গুতা, কুষ্ঠ, স্বরবদ্ধতা, কোষ্ঠবদ্ধতা, পুরুষত্বহীনতা প্রভৃতি বিশটী ইন্দ্রিয়দোষ, মনের উন্মত্ততা, এবং বুদ্ধির ১৭ সংখ্যক অতুষ্টি ও অসিদ্ধি এই সব জীবের দুর্ব্বলতা।

অতঃপর অতুষ্টি ও তুষ্টিতত্ত্ব।

তুষ্টি contentment বা মনের pacific অবস্থা। উহা সংখ্যায় নয়টী। অতুষ্টি তদ্বিপরীত, এবং সংখ্যায় নয়টী। যথা :—(১) অনন্তা=প্রধানের অনন্তিত্ব বোধ (২) তামসলীনা=আত্মামহতের একাত্মতা বোধ (৩) অবিদ্যা=অহঙ্কারের অস্বীকার (৪) অবৃষ্টি=তন্মাত্রার অস্বীকার (৫) অসুতার=ইন্দ্রিয় সুখান্বেষণ (৬) অসুপার=ভোগসুখে আসক্তিস্থিতি (৭) অসুনেত্র=ধনাকাঙ্ক্ষা (৮) অসুমরিচীকা=যোগাসক্তি (৯) অসুত্ত-মম্ভসিকা=পরের অনিষ্ট হইবে অগ্রাহ্য করিয়া ভোগসুখ।

অতঃপর অসিদ্ধিতত্ত্ব। সিদ্ধি অর্থাৎ perfection অতার—সুতার—অতরাতার—অপ্রমোদ—অপ্রমুদিত—অপ্রমোদন—অরম্য—অসৎপ্রমুদিতম। এই হইল অষ্ট প্রকার অসিদ্ধি। যথাক্রমে—অর্থ একে বহুবোধ—তত্ত্বকথার ভুলবোধ—বুদ্ধিহীনতা দোষে তত্ত্বশাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহণে অক্ষমতা—তত্ত্বজ্ঞানে বিরক্তি—সদ্বন্ধুর সুযুক্তিশ্রবণপরাঙ্মুখতা শিক্ষকদোষে জ্ঞানলাভে অসমর্থতা—ইত্যাদি।

মূলিকার্থ তত্ত্ব :—সাংখ্যশাস্ত্রের মূল অষ্ট প্রতিপাদ্য তত্ত্ব। যথা **প্রকৃতির** অস্তিত্ব, একত্ব অর্থত্ব, পরার্থ্যত্ব; পুরুষপক্ষে প্রকৃতি হইতে অন্যত্ব, অকর্ত্তৃত্ব, বহুত্ব। প্রকৃতিপুরুষের ক্ষণিক সংযোগত্ব, এবং পরে স্বতন্ত্রত্ব। সূক্ষ্মশরীরে স্থিতি, স্থূলশরীরেরও স্থিতি (durability)

অনুগ্রহসর্গ=অর্থাৎ পুরুষের ভোগের জন্য প্রকৃতি কর্ত্তৃক অনুগ্রহবশাৎ তন্মাত্রা হইতে জগৎ সৃষ্টি।

অতঃপর ভূতসর্গ=অর্থাৎ জীবজন্তুদের সৃষ্টি। দেবসৃষ্টি, মানব সৃষ্টি, ইতরজীব সৃষ্টি ইত্যাদি।

অতঃপর বন্ধন বা ভোগতত্ত্ব। বন্ধ ত্রিবিধ—(১) অষ্ট প্রকৃতির বন্ধন (২) ষোড়শ বিকারের বন্ধন (৩) দক্ষিণাবন্ধন। ব্রাহ্মণদের যজ্ঞাদি যজন যাজনের জন্য যে দক্ষিণা দিতে লোকে ধর্ম্মভয়ে বাধ্য হইত তাহাকেই কপিল দক্ষিণা বন্ধন বলেন। আসলে উহা মিথাধর্ম্মের বন্ধন।

অতঃপর মোক্ষতত্ত্ব।—ত্রিবিধ মোক্ষ—(১) জ্ঞানাৎমোক্ষ (২) ইন্দ্রিয়-জরাৎ (৩) সর্ব্বধ্বংসাৎ অর্থাৎ সংসারত্যাগাৎ বৈরাগ্যাৎ বা।

অতঃপর দুঃখতত্ত্ব—যে দুঃখের অবসানেই মোক্ষ। ইহাও ত্রিবিধ—আধ্যাত্মিক অর্থাৎ কায়মানসিক—আধিভৌতিক—হিংস্রজীব জন্তু চোর ডাকাৎ ইত্যাদি হইতে, আধিদৈবিক শীতাতপ, বজ্রাঘাত, ভূমিকম্প, প্লাবন ইত্যাদি।

এইখানে তত্ত্বসমাসের পরিসমাপ্তি। উহার তত্ত্বগুলির বিচারকালে যে সব বাক্য প্রতিবাক্য সংজ্ঞা ব্যবহার হইয়াছে তাহাতেই আরো বুঝা যায় যে এই গ্রন্থোক্ত সাংখ্য শাস্ত্র আসলে সংসার সৃষ্টি লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন। আর ইহাই সম্ভব—কেননা ত্রিবিধসুখের অত্যন্ত নিবৃত্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিতে বসিয়া দুঃখের মূল সংসার সৃষ্টি ব্যাখ্যাই ন্যায্য বিষয় হইবে; কি করিয়া nebu- lous homogenous জড় হইতে force যোগে নদ নদী পাহাড় পর্ব্বত, আকাশ বাতাস, জীবজন্তু বন জঙ্গল হইল ইহা ভবরোগের চিকিৎসকের কাছে ধানভানতে শিবের গীতের মতই হইবে। 'সংসার-সৃষ্টি' আর cosmic-জগৎ সৃষ্টি যে মহর্ষি কপিল মতে ভিন্ন তত্ত্ব এবং প্রত্যেকের স্রষ্টা। যে ভিন্ন—তাহা—তত্ত্ব সমাসের ভাষ্যকার স্পষ্টই উল্লেখ করিয়াছেন। সংসার সৃষ্টি—অবিবেকীপুরুষ ও ক্রিয়াশীল ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির সংযোগে ঘটে—আর বিশ্বসৃষ্টি তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সৃষ্ট। অনুগ্রহসর্গ তত্ত্ব বিচারে দেখা যায় ব্রহ্মা পুরুষের ভোগের জন্য পঞ্চতন্মাত্রা হইতে ইন্দ্রিয়দের অনুভূতির জন্য জড়জগৎ সৃষ্টি করিলেন; ভূতসর্গ বিচারে দেখা যায় ব্রহ্মা সেই উদ্দেশ্যে ছতুর্দ্দশভুবনের দেব মনুষ্য জীবজন্তু তরুলতাদি সৃষ্টি করিলেন। স্পষ্টই বুঝা গেল, প্রকৃতি যোগে জড় বা জঙ্গম জগৎ সৃষ্টির কোনা কথা নাই; এজন্য ব্রহ্মার কর্ত্তৃত্ব অনুমিতবা স্বীকৃত হইল। প্রকৃতি পুরুষ কেবল মাত্র সংসার সৃষ্টির জন্য দায়ী, যে সংসারজীবের সকল দুঃখের মূল। ইহা বিশুদ্ধ psychological creation মানস সৃষ্টি পূজ্যপদ শ্রীধর স্বামীগীতার১৩ দশঅধ্যায়তাহাই বলিয়াছেন। ২৬।২৭শ্লোকেরটীকাদ্রষ্টব্য।

এক্ষণে কি উপায়ে দুঃখ নাশ করা যায় তাহা নির্ণয় করিতে গেলে, দুঃখের যে হেতু তাহার বিচার চাই; অর্থাৎ সংসারই দুঃখের মূল। এই সংসার কি; কেমন করিয়া গড়িয়া ওঠে? কি করিয়া জীবকে বন্ধন করে? এ সবের বিচার কর্ত্তব্য; সংসারকে নাশ করিতে গেলে, যাহার ক্রিয়া ফলে সংসার, তাহার নাশ দরকার, কার্য্যকে উড়াইতে গেলে কারণকে উড়াইতে হইবে সংসার কারণ হইতেছে অজ্ঞান বা অবিদ্যা, সেই অবিদ্যার ধ্বংস চাই; কেমন করিয়া অবিদ্যার নাশ হইতে পারে? উহার বিপরীত শক্তি জ্ঞান, বিবেক জ্ঞান তাহারি সাহায্যে অবিদ্যাকে নষ্ট করিতে হইবে; যেমন অন্ধকার নাশ করিতে গেলে আলোর দরকার। গীতাকার ১৩ দশ অধ্যায় ২৬।২৭ শ্লোক তাহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হিন্দু দর্শন শাস্ত্র যদি পাশ্চাত্য দর্শনের সমজাতীয় শাস্ত্র হইত, অর্থাৎ কেবলমাত্রই পরম তত্ত্বের আলোচনা হইত তাহা হইলে দুঃখনাশ করিবার হাঙ্গামা লইয়া এত মাথা বকাইত না; কি দুঃখ, কেন দুঃখ, কিরূপে ইহার নিবৃত্তি হইবে, হইলে কি অবস্থা হয় এসব তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় হইতে পারেনা। কিন্তু হিন্দু দর্শন আসলে মোক্ষশাস্ত্র গৌনভাবে তর্কশাস্ত্র। জীবের ভাগ্যের সঙ্গে জড়জগৎটা জড়াইয়া আছে বলিয়াই মোক্ষ-শাস্ত্রকার জড়জগতের স্থিতি উৎপত্তি লয় লইয়া মাথা ঘামাইয়াছেন; জীবের অধ্যাত্ম প্রকৃতির সঙ্গে উহার কোনো সম্বন্ধ না থাকিলে মোক্ষশাস্ত্রকাররা উহাকে আমলেই আনিতেন না, উহা অপরাবিদ্যার বিষয়ীভূত হইয়া থাকিত। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রধান সমস্যার মধ্যে জীবের গতিমুক্তি ভাগ্যাভাগ্য একটা সমস্যাই নয়; উহা অবান্তর ভাবে আলোচিত। কিন্তু হিন্দু দর্শনের উহাই প্রধান প্রতিপাদ্য প্রধান আলোচ্য বিষয়। কাজেই মনে হয় সাংখ্য বা বেদান্তে Spencer Darwin এর Evolution তত্ত্ব খুঁজিতে যাওয়ায় সব স্থানে নিরাপদ নহে।

সম্পূর্ণ বিপরীত পন্থা পাশ্চাত্যদর্শন ও হিন্দুমোক্ষশাস্ত্রের মধ্যে parallelism খুঁজিতে গিয়া এখনো তর্কযুদ্ধ কত যে হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই 'মায়া' 'অবিদ্যা', 'অজ্ঞান' অবিবেক কথা গুলাই যে মহাপ্রবল সাক্ষী যে ভারতীয় আর্য্য দর্শনশাস্ত্র মূলতঃ মুক্তিশাস্ত্র। তা না হইলে বিশ্বসৃষ্টি cosmic creation বুঝাইতে গিয়া 'মায়া' 'অবিদ্যা' ইত্যাদিকে ব্রহ্মের সৃজনাশক্তি বলা কেন? সোজা সরল বৈজ্ঞানিক কথা ব্যবহার করিলেই হইত না কি?

attraction, repulsion ইত্যাদি ইত্যাদি। আসলে সাংখ্য বেদান্তত spencer প্রভৃতির মত cosmic সৃষ্টির (ভৌতিক সৃষ্টির) শাস্ত্র নহে—সাংখ্য বেদান্ত সংসারসৃষ্টি লইয়াই মাথা ঘামাইয়াছেন।—এই যে আসলে নির্গুণ জগৎটার ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যগুলা আমার কল্পনার ধারা ভাল মন্দ, ছোট বড়, সুন্দর অসুন্দর, হেয়-প্রেয় রং মাখিয়া সংসার সাজিয়া আমাকে ভুলাইতেছে সুখ দিতেছে, দুঃখে মজাইতেছে ইহাই আমার সব কষ্টের মূল; আমার আসল স্বভাবে নির্ব্বিকার আত্মাটা এই রঙ্গীন আবরণ হইতে রং মাখিয়া দেহের সঙ্গে নিজেকে ভুল করিয়া অনর্থ ঘটাইতেছে—মোক্ষশাস্ত্র কৃপায় আমি বুঝিতে পারি আত্মা দেহ নয়, উহার কোনো বিকার হয়না, উহা নিঃসঙ্গ সুখ ভোগে নয়, সুখ আত্মবোধে; জগৎটা ব্রহ্মভাবেই সত্য, সংসারভাবে মিথ্যা, আর আমি জগতেরই একটা অংশ, জগৎই ব্রহ্ম; যেমন পাতা ফুল, মূল, কাণ্ড, লইয়া 'গাছ', তেমনি এই "নদ নদী-পাহাড় বন, মানুষ কীট পতঙ্গ, আকাশ-বাতাস জল-স্থল, সুখ-দুঃখ, ভয়-ভাবনা, হর্ষ-বিষাদ", ইত্যাদির সমষ্টিকেই বলি ব্রহ্ম; একে বহু, বহুতে এক। এই দৃশ্যমান বিচিত্র সত্তা ছাড়া আর একজন হাত পা চোখ নাকওয়ালা ভগবান কোথাও নাই। যা সৎ তাই ঈশ্বর বা ব্রহ্ম। হইতে পারে তাঁর নির্ব্বিশেষ অবস্থা ছিল; কিন্তু সবিশেষেই তাঁহাকে দেখিতেছি, বুঝিতেছি, উপাসনা করিতেছি। অজ্ঞানে বা মোহে, জগৎকে ঈশ্বর হইতে অন্য দেখি, আর জগতের পরিবর্ত্তনশীল, পদার্থগুলিকে, পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া নিত্য ও অনশ্বর ভাবে আছে বলিয়া মনে করি। নিত্যকে অনিত্য অনস্তি ভাবি, আর অনিত্যকে নিত্য বলিয়া ভুল করি। এই যে জগতে সংসার জ্ঞান, ইহা মিথ্যা নয়তো কি? মায়া নয়তো কি? কল্পনার খেলা নয়তো কি? শংকর সংসার সৃষ্টির মূলে অবিদ্যা বা মায়া বলাতে কিছুইতো অন্যায় করেন নাই, বরং অত্যন্ত খাঁটী কথাই বলিয়াছেন। তিনি যদি কোথাও বলিতেন অবিদ্যা বলে ইট কাট্ মাটী পাথর, জল স্থল পর্ব্বত এই সব তৈয়ারি হইতেছে আর ভগবান মোহ বলে, অবিদ্যায় মজিয়া, আকাশ বাতাস, জলস্থল নদ নদী পাহাড় জীবজন্তু করিতেছেন তাহা হইলে মানিতাম এ আবার কি! একি বুঝা যায়? আমি একটী ছবি আঁকিলাম; ওয়াট সাহেব ইনজিন করিলেন; লেসলি সাহেব সাঁকো গড়িলেন এসব কি অবিদ্যায় মজিয়া গড়িলেন? তার কি অর্থ হয়? কিন্তু যদি বলি রাখবাবু সুখী হইবে বলিয়া মদ ধরিল, বা মোটর কিনিল, বা বিবাদী প্রতিবেশীকে খুন করিল, এবং

অবিদ্যা বলে এসব করিল, তখন মানিব তাহা সত্য। এখানেই অবিদ্যার কাজ; সাঁকো গড়া বা ছবি আঁকা বা এন্‌জিন্ করা অবিদ্যার কাজ নয়। তেমনি ব্রহ্ম শক্তি বলে বিচিত্র বিশ্ব গড়িলেন; এ শক্তি মায়া নয়, অবিদ্যা নয়, অজ্ঞান নয়। মায়া রূপকভাবে বলিতে পার। মায়া জীবের বেলাতেই প্রযোজ্য। কিন্তু যখন জীব জগতকে নিজ উপযোগী হেয়প্রেয় ভাবাত্মক সংসারে পরিণত করে; তখনই বলিতে পারি আমার pure Ego শুদ্ধ বুদ্ধনির্ব্বিকার ব্রহ্ম অংশ বাহ্য জগতের সঙ্গে নিজেকে জড়াইয়া Empirical Ego বা self বা মায়া সংসার রচনা করিল। এই Empirical self কেই চরম সত্য মনে করাতেই জীবের যত দুঃখ ভজন।

শংকরাচার্য্য যেখানে জগৎকে অবিদ্যার বা মায়ার সৃষ্টি বলিয়াছেন সেখানে জগৎ মানেই সংসার বুঝিতে হইবে। কেন না জীবের বিশেষতঃ বদ্ধ জীবের চোখে জগৎ সংসার ভাবেই বিরাজ করে। জগতের সঙ্গে জন্মমাত্র হইতেই হেয় প্রেয় সম্বন্ধ। জন্ম হইতেই জীব দেহাত্মবাদী, অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মাকে দেহের সঙ্গে এক মনে করে। এই জন্যই জগৎ তার চক্ষে সংসার সঙ্গে একার্থবোধক হইয়াছে। শংকর যখন বলিলেন জগৎ অবিদ্যাপ্রসূত; তখন তিনি বলিতে চান সংসার অবিদ্যাপ্রসূত। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁৎ ধরিলেন জগৎ (cosmos) কি করিয়া অবিদ্যাপ্রসূত হইতে পারে? কেন না অবিদ্যা কার? ব্রহ্মের; কিন্তু ব্রহ্ম স্বভাবে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিত্য, তিনি কেন ignorance বা illusionএর দাস হইবেন? ইত্যাদি ইত্যাদি—

তাই বলিতেছি সাংখ্য বা বেদান্তকে—মুখ্যতঃ মোক্ষশাস্ত্র ভাবে বুঝিলে এই সব গোলমাল কাটিয়া যায়। শংকরের রচিত চর্পটচারিকা স্তোত্র (দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ etc) পাঠ করিলে দেখা যায় আচার্য্য এই সংসার সকল ভবব্যাধির মূল তাহাই অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন, নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারঃ। জ্ঞাতে তত্ত্বে—কঃ সংসারঃ ॥ ১০ ॥ এই অর্দ্ধ শ্লোকেই শংকরের সমস্ত **আত্মাতত্ত্ব সংসারতত্ত্ব মুক্তিতত্ত্ব** প্রকাশ হইয়াছে।

অতএব শংকরাচার্য্যের দর্শন শাস্ত্রে আলোচিত জগৎতত্ত্ব ও মায়াবাদ বুঝিতে কোনই গোল হয় না যদি জগৎকে সংসার ধরা যায়। এবং উহাই সত্য অর্থ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রেমের জয়

[শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মল্লিক]

আজি পাপের করিতে শেষ
ই ছুটিয়াছে কোটী প্রেমের মূরতি শচীনন্দন রে।
কিবা বীর সন্ন্যাসী বেশ!
সবে মেতে যায় গাহি সত্য মুক্তি জয় বন্দন রে!
ওই নিমাই এসেছে আজ
এল কোটী শচীমাতা ঘর দ্বার ছাড়ি ধীর সহিষ্ণু হিয়া,
সাথে পরিয়া শক্তি সাজ
এল বীর জায়া কোটী পুণ্য প্রতিমা দেবতা বিষ্ণুপ্রিয়া।
ওই পথে পথে দ্বারে দ্বারে
চলে মাতা বধূ সুত বীরের বাহিনী—আননে দৃপ্ত হাসি;
কহে হুঙ্কারি বারে বারে
জয় সত্যম্ জয় মুক্তিঃ জয় মুক্ত-ভারতবাসী'!
সবে লাঞ্ছনা ভীতি হারা—
চলে, অঙ্গে অঙ্গে স্ফুরিয়া উঠিছে করুণা স্নিগ্ধ বিভা!
চলে জীবন্মুক্ত পারা,
আহা বক্ষে বক্ষে প্রেমের পাথার উথলিয়া পড়ে কিবা!
আজি দেখ্‌রে অবিশ্বাসি,
ওরা কত শত পাপী জগাই মাধাই করে গেল উদ্ধার,
শুধু বিলায়ে ক্ষমার রাশি
ওরা যেচে দিল প্রেম কত মার খেয়ে, নাহি নিল শোধ্ তার।
আজি অনাহত চির জয়ে
ওরা চলিয়াছে দেশ মথিয়া মথিয়া গাহিয়া বিজয় গান,
আজি ঘোষিতে সত্যময়ে
সবে মুক্তি পতাকা উড়ায়ে ছুটেছে, দেখে কাঁপে শয়তান!

আজি স্বাধীন করিতে দেশ
সবে চলে যায় দলি চরণে মরণ ভয় বন্ধন রে!
আজি পাপের করিতে শেষ
ওই ছুটিয়াছে কোটী প্রেমের মূরতি শচীনন্দন রে!

পতিতার সিদ্ধি

[শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(৩৩)

দশটা বাজিয়া গেল, তবু ব্রজেন্দ্র ফিরিল না। পূজারী ঠাকুর অন্যান্যদিন ইহার পূর্ব্বে ঠাকুরের পূজা সারিয়া চলিয়া যায়, সেও ত আসিল না। স্বামীর খবর লইতে নির্ম্মলা হেমাকে চারুর বাড়ী পাঠাইয়াছিল, এক ঘণ্টার উপর হইল, সেওত এখনও ফিরিয়া আসিল না!

নির্ম্মলা এইবারে বিশেষরূপ চিন্তিতা হইল। সত্য সত্যই তবে কি সর্ব্বনাশী অনুতাপের জ্বালা সহিতে পারিল না, গঙ্গাজলে প্রাণটা বিসর্জন দিল?

পূর্ব্বে যথার্থই নির্ম্মলার মনে চারুর মৃত্যুর আশঙ্কা উপস্থিত হয় নাই। সে ভাবিয়াছিল, মনের আবেগে হয়ত মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য কোথাও গিয়া থাকিবে। আবেগটা শান্ত হইলেই আবার সে ফিরিয়া আসিবে। এখন যেন তার মন বলিতেছে সে আর আসিবে না।

কিন্তু ভট্টাচাজ্জি মশাই এখনও আসিল না কেন? তাহার না আসিবার একমাত্র কারণ হইতে পারে, পূর্ণপ্রকোপ না থাকিলেও, অবসানমুখে ঝড়ের এলোমেলো ভাব ও মাঝে মাঝে বৃষ্টি। কিন্তু এ কারণে নির্ম্মলা সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। স্বামী ফিরিয়া আসিবার অথবা হেমা সেখান হইতে কোনও সংবাদ আনিবার পূর্ব্বে যদি রাখু ঠাকুরের পূজা ও ভোগ সারিয়া যাইত, তা হ'লে সে যেন নিশ্চিন্তা হইতে পারিত। ইহার পর, পূজার সময়ে যদি তাহার স্বামী অথবা হেমা হঠাৎ সে মেয়েটার মরার খবর লইয়া আসে? মেয়েটা নষ্ট হইলে কি হইবে—সে ভট্চাজ্জি মশায়ের স্ত্রীত বটে! সে মরিলে তাঁরত অশৌচ হইবে! সেরূপ অবস্থায় সে রাখুকে কেমন করিয়া ঠাকুর ছুইতে দিবে?

এগারোটা বাজিতেও যখন কেহ কোনওদিক হইতে আসিল না তখন পূজার জন্য রাখুর অপেক্ষা করা নির্ম্মলার অসম্ভব হইয়া উঠিল।

তেতলায় ছিল ঠাকুর ঘর সেইখানে বসিয়া নির্ম্মলা রাখুর অপেক্ষা করিতে ছিল। সে ছাদে আসিয়া আলিসা হইতে মুখ বাহির করিয়া ডাকিল—"সরি"।

"তাকে আমি বাজারে পাঠিয়েছি বৌমা।"

নির্ম্মলা শুধু মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার শাশুড়ী বলিতে লাগিল—"হেমা বাড়ীতে নাই, হিন্দুস্থানী চাকরটাও আসেনি—তুমি পূজারী ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ ক'রেছ মনে নেই?"

"যথার্থই সে কথা আমার মনে ছিলনা ত মা! পাঠিয়ে ভালই করেছ।"

"কিন্তু পূজাত এখনও ঠাকুরের হল না।"

"সেই জন্যই ত সরিকে ডাকছিলুম। ভট্চাজ্জি মশায় কেন আস্‌ছেন না জান্‌তে তাকে পাঠাব।"

"ব্রজেন্দ্র কি তাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে?"

চমকিতার মত নির্ম্মলা প্রতি প্রশ্ন করিল—"এ কথা তোমাকে কে বল্‌লে মা?"

"সরি বল্‌ছিল।"

"আমি যা শুন্‌লুম না, তা সরি কেমন ক'রে শুন্‌লে? সে কি বল্‌ছিল?"

"বলছিল, বাবু আর ও বামুনকে ঠাকুর ছুতে দেবেন না। তার স্বভাব নাকি ভাল নয়!"

"কই মা, আমিত এ কথা তোমার ছেলের মুখে শুনিনি!"

"স্বভাব যদি ভাল না হয়, তাহ'লে তাকে পূজো করতে দেওয়া ত উচিত নয়।"

"নিশ্চয়। তোমার ছেলে এলে এ কথা তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ব।"

"ব্রজেন্দ্রই বা আজ এমন দিনে কোথায় বেরুলো বউমা?"

"একটা বিশেষ জরুরি কাজের জন্য আমিই তাকে এক জায়গায় পাঠিয়েছি।"

"পাঠাবার কি আর দিন পেলেনা মা?"

"তাঁর ফিরতে যে এতটা দেরি হবে সেটা তখন বুঝতে পারিনি। তাঁকে ডেকে আনতে হেমা হতভাগাটাকে পাঠালুম, সেও এখনও ফিরছেনা কেন বলতে পারি না।"

"বামুন যদি না আসে তাহ'লে পুজোর কি হবে ?"

"বামুনের আসা না আসার কথা তোমার ছেলেই যদি জানে, সেই এসে পুজো করবে !"

শাশুড়ী বুঝিল বউএর একটু রাগ হইয়াছে। সে বলিল—"ছেলের উপর রাগ করবার কথা কিছুইত নেই মা।"

নির্ম্মলা উত্তর করিল না।

শাশুড়ী তখন কথাগুলা যতটা পারিবার' মিষ্ট করিয়া বলিল—"রাগ করনা বউমা, ছেলে আমার মুখ নয়। তোমার ননদের পানে আর চাওয়া যায় না—বুঝেছ ?"

"শুধু ননদ কেন মা, স্বভাব খারাপ হ'লে, আমরাইবা কেমন করে তার সুমুখে দাঁড়িয়ে কথা কব !"

"কলতলায় একখানা কাপড় দেখলুম, সেখানা কার ? সরি বললে ভট্চাজ্জি মশার।"

"সরি ঠিক বলেছে, সেখানা তারই কাপড়।"

"সেখানায় কি রঙ লেগে রয়েছে দেখলুম।"

"বোধ হচ্ছে আলতা।"

"তুমি দেখেছ ?"

"দেখেইত তাঁকে সে কাপড় ছাড়িয়ে দিয়েছি।'

"তাতে একখানি আশু পায়ের দাগ।"

এ কথায় নির্ম্মলা হাসিয়া ফেলিল।

"মিছে কথা কইনি বউ মা—বিশ্বাস না হয় তুমি দেখে এসো।"

"মিছে কথা কেন হবে মা—আমিও তা দেখেছি।"

"তবে ?"

ঠিক এই সময়ে শুভা উপরে আসিয়া বলিল—"সব রঙ উঠিয়ে দিয়েছি বৌদি।" বলিয়াই সে নির্ম্মলাকে রাখুর কাপড় দেখাইল।

"তাইত রে, ধোপানীকে হারিয়ে দিয়েছিস যে ! যা ভাই বারান্দার ভিতরে কাপড়খানা শুকুতে দে। ভট্চাজ্জি মশাইয়ের যাবার আগে যেন শুখিয়ে যায়।"

শুভা চলিয়া গেল। যতক্ষণ সে ছিল, তার মা শুধু অবাক হইয়া চাহিয়াছিল চাহিতে চাহিতে তার মুখখানা রাগে রাঙা হইয়া উঠিল। নির্ম্মলা তার মুখখানা দেখিল। তাহাকে লুকাইয়া একটু হাসিল।

কন্যা চলিয়া গেলে, যখন তার মা নির্ম্মলার দিকে ফিরিল, তখনও তার মুখ হইতে কথা বাহির হইল না।

"কি মা, তোমার মেয়েকে দিয়ে ওই কাপড় কাচিয়েছি বলে কি তোমার রাগ হ'ল ?"

"আমার রাগে কার কি এসে যায় মা। আমি তোমাদের আশ্রয়ে আছি।"

"এইটেই যে রাগের কথা হল মা—আমি জানতুম, আমরা তোমার ছেলে, মেয়ে নাতী নাতনী সব তোমারই আশ্রয়ে আছি।"

এমন মনুষ্যত্ব-হীনতা শুভার মায়ের ছিল না যে, এরূপ কথাতেও তার মুখ প্রফুল্ল না হয়। শুধু তার মুখ প্রফুল্ল হইল না, তার চোখের কোণে জল আসিল। বলিল "আমিও মা ব্রজেন্দ্রকে যে পেটে ধরিনি, এ একদিনের জন্যও মনে করতে পারিনি, মিছে কইব কেন, রাগ আমার হয়েছিল। বোকামেয়ে আইবুড়ো ননদকে দিয়ে—"

"আমি নিজেই কাদছিলুম মা, অভাগী পায়ে এমন রঙ লাগিয়েছে কোনও মতে তুলতে পারছিলুম না দেখে, তোমার মেয়ে উপর-পড়া হয়ে কেড়ে নিলে।"

"আবাগী কে ?"

"গরীব ব্রাহ্মণের উপর তার অত্যাচারের যেটুকু বাকী ছিল, আবাগী তার কাপড়ের উপর দেখিয়েছে।"

"আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনা বউমা, আবাগীকে ?"

'আবাগীর পরিচয় দিবার একটা সুবিধা নির্ম্মলার ঘটিয়াছিল, কিন্তু বলিবার মুখে তার এমন একটা সঙ্কোচ আসিল যে কিছুতেই কথা তার মুখ হইতে বাহির হইল না। এদিকে তার শাশুড়ী সাগ্রহদৃষ্টিতে উত্তরের প্রতীক্ষায় তার মুখের পানে চাহিয়া কি করে, নির্ম্মলাকে বলিতে হইল, সে চরণচিহ্নটির অধিকারীর কথা—

"মা ! সেটি তোমার ছেলের সো-রাণীর।"

অতি বিস্ময়ে নির্ম্মলার চোখের উপর বিস্ফারিত দৃষ্টি রাখিয়া 'মা' বলিয়া উঠিল—

"বলিস্ কি গো ! ব্রজেন্দ্র কি তবে বামুনকেই খুন করতে বন্দুক নিয়ে যাচ্ছিল ?"

এ কথার উত্তর নির্ম্মলা দিতে না দিতে নীচে হইতে এক কণ্ঠস্বরে উভয়েই নিস্তব্ধ হইয়া গেল। "ঠাকুর মা কোথায় গো !"

কথা শুনিয়াই নির্ম্মলা বুঝিল স্বামী নিরীহ ব্রাহ্মণের উপর ঈর্ষায় একটা অকার্য্য করিয়া বসিয়াছে। তার মুখ দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া গেল। শুভার মা বুঝিল, সে চরিত্রহীন বামুনটাকে সত্য সত্যই ব্রজেন্দ্র আর ঠাকুর ছুঁইতে দিল না।

কুতুহলীর মুখ লইয়া সে উপরে আসার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

(৩৪)

উভয়েই বুঝিল কে আজ পুজা করিতে আসিতেছে।

তাহার নাম মধুসূদন। যজমানেরা বলিত মধুঠাকুর। রাখুর পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রের বাড়ীতে সে পুজারির কার্য্য করিত। পুজার পদ্ধতি ভাল জানিত না, আর মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারিত না বলিয়া ব্রজেন্দ্র রাখুকে তাহার স্থানে ঠাকুর পূজার কাজে নিযুক্ত করিয়াছিল। উভয়েই বুঝিল সেই মধুই পূজারির কাজে পুনর্নিযুক্ত হইয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিবার পর মধুর সিঁড়িতে উঠার শব্দ যেই নির্ম্মলার কাণে গেল, অমনি সে আপনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিয়া শাশুড়ীকে বলিল—"মা! আর বিলম্ব না ক'রে তুমি ঠাকুরের ভোগ নিয়ে এসো।"

প্রকৃতিস্থ বলিলাম কেন, এই ক্ষণমাত্র সময়ের মধ্যে এতগুলা চিন্তা একসঙ্গে তার মনকে আক্রমণ করিয়াছিল যে, সেই ক্ষুদ্র পলটুকুর মধ্যে সে আপনাকে এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল।

"যাও মা, আর দাঁড়িয়ো না।"

"তাইত ব্যাপার টাকি বউ মা?"

"আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই মা, বুঝতে পারছি ঠাকুরের অদৃষ্টে আজ উপবাস আছে, তবু তার সমুখে অন্ন পাত্র ত একবার ধরতে হবে।"

বলিয়া নির্ম্মলা ঠাকুর ঘরে চলিল।

তেতলায় আসিবার দ্বারে পৌছিয়াই, শুভার মাকে দূর হইতে যেমন দেখা, মধু বলিয়া উঠিল—"কিগো ঠাকুর মা কেমন আছেন?"

হারানো চাকরির পুনঃ প্রাপ্তির উল্লাস—ঠাকুরমার কাছে আসিয়া কথা কহিতে মধুর দেরি সহিল না। তার উল্লাসের উচ্চারিত কথা নির্ম্মলা অতি দূর হইতেও শুনিতে পাইল। শুনিয়া একবার সে মুখ ফিরাইল মাত্র, নিজে আর ফিরিল না।

শুভার মা সেটা দেখিল। তার কৌতূহল রঞ্জিত দৃষ্টি সেই সঙ্গে সপত্নী পুত্র-

বধুর মুখে এমন একটা বিবর্ণতা দেখিতে পাইল যে, নির্ম্মলার অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত শুভার মা চোখকে আর মধুর দিকে ফিরাইতে পারিল না।

"কি ঠাকুর মা, কথা শুনতে পেলেন না?"

"কেও, মধু।"

"সেই মুখ্যু মধু। কেমন আছেন?"

শুভার মা উত্তর দিলেন না। সে মধুর মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

"দেখে আশ্চর্য্য হবারই কথা ঠাকুর মা।"

"তুমি যে আজ পুজো করতে এলে?"

"আবার আসতে হ'ল। নারায়ণ ত আর মন্তর খান না, বুজরুকিও খান না—খান শুধু ভক্তি। তাই আবার মুখ্যু মধুকে টান দিলেন।"

"ও ঠাকুর কি আর আসবে না?"

"আবার! কর্ত্তা মশাই তাকে, গলায় হাত দিয়ে, বাসা থেকে বার ক'রে দিয়েছেন।"

তাহারা অনেক পূজারি এক পূজারির আশ্রয়ে কার্য্য করিত। ব্রজেন্দ্র প্রভৃতি বহু গৃহস্থ তাহারই যজমান। একা বহুলোকের গৃহে পূজা করা অসম্ভব বলিয়া যারি পাঁচজন ব্রাহ্মণ যুবককে সে পূজার জন্য নিযুক্ত রাখিত। রাখু তাহাদেরই মধ্যে একজন। বৃদ্ধকে তাহারা কর্ত্তা মশাই বলিত। তাহারা কর্ত্তামশায়েরই সঙ্গে এক বাড়ীতেই থাকিত। সে যেখানে পূজার সামগ্রী চাল কলা দুগ্ধ মিষ্টান্ন পাইত, সমস্তই কর্ত্তার সম্মুখে উপহিত করিতে হইত। সেই সব আতপ তণ্ডুল হইতেই তাহাদের মধ্যাহ্নের আহার চলিত।

'কর্ত্তা মশায়'কে শুভার মা'র বুঝিতে বাকি ছিল না। এটাও বুঝিতে তার বাকি রহিল না, ব্রজেন্দ্রের রক্ষিতার ঘরে ওই মুখচোরা ভিজে বিড়ালের মত বামুনটা ঝড়ের সমস্ত রাত যাপন করিয়াছে।

তথাপি, যেন কিছুই জানে না, এমনিভাবে বিস্মিতার মত শুভার মা প্রশ্ন করিল "কেন মধু?"

"আপনার আর সে কথা শুনে কাজ নেই ঠাকুর মা! সে অতি কুৎসিৎ কথা।" তারপর বলিবে না বলিবে না করিয়া, শুভার মা'র শুনিবার আগ্রহে, রাখুর চরিত্রগত এত কুৎসা মধুঠাকুর তাহাকে শুনাইয়া দিল যে, শুভার মা'র পিপাসু কর্ণও রাখুর ততটা নিন্দা শুনিবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। রাখু চিরটা-কাল যাত্রার দলে ঢোল পিটিয়া দেশ বিদেশে ঘুরিয়াছে। তার স্ত্রী স্বামীর চরিত্র

দোষের জন্য জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে। কুলীন হইলেও এই চালচুলা নাথাকা চরিত্রহীনটাকে আর কেহ কন্যাদানে সাহসী হয় নাই, স্বভাবের দোষের জন্য, যে মামীর বাড়ীতে সে আজন্ম মানুষ হইয়াছে, সেখানেও আর তার স্থান নাই। তার মামী—রাখুর মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—হতভাগাটাকে বাড়ীতে রাখিতে সাহস করে নাই। পেটের দায়ে কলিকাতায় আসিয়া ভাল মানুষটি সাজিয়া বোকা কর্ত্তামশায়ের চোখে সে ধূলা দিয়াছিল। 'বাবু' নিতান্ত সরল, মা', ঠাকুর মা—ইহারা ত মাটীর মানুষ—ইহাদের যে সে ধূর্ত্ত সহজে ভুলাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু সাধু সাজিলে কি হইবে, স্বভাব ত আর পরিচ্ছদে ঢাকা পড়ে না! ডুব দিয়ে জল খাওয়াত চিরদিন চলে না, বাছাধন পূর্ব্বরাত্রিতে একটা 'নটীর' ঘরে হাতে নাতে ধরা পড়ে গেছেন।—সমস্ত কথা বিনাইয়া বিনাইয়া মধু শুভার মাকে শুনাইল।

তবে কে যে রাখুকে ধরিল, আর কে যে সে কথা প্রকাশ করিল, একথা মধুসূদন হিসাব করিয়া বলিতে পারিল না। কিন্তু ধরা পড়াটা যে ঠিক, একথা সে শালগ্রাম ছুঁইয়া হলফ্ করিয়া বলিতে প্রস্তুত ছিল।

সে রকম অসৎ স্বভাবের লোক দিয়া ত আর ব্রজেন্দ্র বাবুর মত মহৎ লোকের বাড়ীতে পূজার কাজ চলিতে পারে না, তাই ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা বিপত্তির মধুসূদনকে আবার সেখানে আসিতে হইয়াছে।

আরও কতক্ষণ তাহারা কথা কহিত ঠিক ছিল না, কেননা উভয়েই যে যার কর্ত্তব্য ভুলিয়াছিল, যদি না নির্ম্মলা মধুর ঠাকুর ঘরে প্রবেশের অযথা বিলম্ব দেখিয়া সেখানে উপস্থিত হইত।

তাহাদের উভয়কেই দু'একটা মিষ্ট তিরস্কার করিবার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও নির্ম্মলা তাহাদিগকে কিছু বলিল না। কিন্তু তাহার না বলা কিছু বলার অপেক্ষা অধিক তিরস্কারের কাজ করিল। দুইজনেই অপ্রতিভের মত ক্ষণেক নিস্পন্দের মত দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু শুভার মা যখন দেখিল, কোনও কথা না কহিয়া, তাহার সপত্নীপুত্রবধু চলিয়া যায়, তখন তাহাকে শুনাইয়া মধুকে বলিল—"যাও মধু, বউমা পূজোর আয়োজন ক'রে এসেছে। বাবু তোমাকে যখন আসতে বলেছেন তখন তোমার অপরাধ কি।"

"বাবু আসতে না ব'লে পাঠালে আসব কেন ঠাকুর মা!"

উভয়ে উভয়দিকে চলিয়া গেল।

ঠাকুরের অন্নভোগ শুভার মা রাঁধিত এবং ভোগের পর প্রসাদ গ্রহণ করিত।

ব্রাহ্মণ গৃহের বিধবা সে, অন্যের সে-অন্ন-স্পর্শের অধিকার ছিল না। থাকিলে, নির্ম্মলা নিজেই তাহা ঠাকুর ঘরে বহন করিয়া লইয়া যাইত, ওই মিথ্যাবাদী বামুনটার মুখ হইতে রাখুঠাকুরের নিন্দা শুনিতে শাশুড়ীর অমন আগ্রহ দেখিয়া তাহারও উপরে তার এমন রাগ হইয়াছিল। মধু কি বলিয়াছে যদিও সে শুনে নাই, কিন্তু রাখুর চরিত্র সম্বন্ধে সে যে অনেক কথা বলিয়াছে, ইহাতে নির্ম্মলার সন্দেহ মাত্র ছিল না। সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল, রাখু পূজা করিতে আসুক আর না আসুক ও বামুনকে সে কখনই পূজারি নিযুক্ত হইতে দিবে না।

অনেকক্ষণ পুঁটিকে কোলে করিতে পারে নাই, আর এক ঝিয়ের কোলে দিয়া তাহাকে বাহিরে পাঠাইয়াছে কন্যাকে দেখিবার ব্যাকুলতায় নির্ম্মলা সর্ব্ব নিম্নতলে সদরে বাহির হইবার দূরে উপস্থিত হইয়াই যেই ডাকিল 'ঝি', অমনি পিছন দিক হইতে শুভা তাহাকে ডাকিয়া উঠিল—"বৌদি!"

নির্ম্মলা পিছনে চাহিয়াই দেখিল শুভা।

"কি র‍্যা।"

"পুরুত মশাই চলে যাচ্ছেন কেন?"

কে পুরুত নির্ম্মলার বুঝিতে বাকি রহিল না। নির্ম্মলা দেখিল শুভার একহাতে ছাতি, অন্য হাতে গরদের কাপড়।

"চলে গেলেন!"

"বোধ হয় গেছেন। আমার হাতে এই দু'টো দিয়ে বললেন, তোমার বউদি'কে দিও। আর ব'ল আমার এখানে খেতে আসা হবে না, আজই আমি দেশে যাব।"

"তিনি চলে গেলেন কি না একবার দেখে আসবি শুভা।"

"বাইরে যাব?"

"তুই যা, কেউ কিছু বলে, জবাবদিহি আমার।"

শুভা চলিল, একটু দ্রুতই চলিল। নির্ম্মলা আবার তাকে বলিল—"দেখতে পাস্ ডেকে আনবি, আমার নাম ক'রে।"

ক্রমশঃ

রূপকথা

[অধ্যাপক শ্রীমোহিনীমোহন মুখোপাধ্যায় এম্ এ]

ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মানসিক সম্প্রসারণ শিক্ষা দিবার জন্য দেশী ও বিদেশী অনেক উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। কেহ আবৃত্তি কেহ কণ্ঠস্থ করা কেহবা পড়িয়া যাওয়ার পক্ষপাতী! কিন্তু অত্যন্ত শিশুকালে আমাদের মনের মধ্যে যে শক্তি জাগ্রতী হইয়া থাকে তাহারই উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা কেহই বড় বেশী করে না। বিস্ সাহেবের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার খসড়ায় দেখা যায় যে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য সে সব শিক্ষার উপায় ও পন্থা কল্পিত হইয়াছে, তাহা এদেশের পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী। অথচ আমেরিকার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্, জার্ম্মাণী, জাপান প্রভৃতি স্বাধীন দেশে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পন্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সব দেশে যাহাতে শিশু হৃদয়েও স্বদেশ-প্রেম, ভাবুকতা ও নির্ভীকতা জাগিয়া উঠে প্রাথমিক শিক্ষার মূলে তাহারই ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আমাদের দেশে 'প্রথম ভাগ', 'দ্বিতীয় ভাগ,' 'শিশুশিক্ষা,' 'হিতোপদেশ' প্রভৃতি শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী নানাকারণে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ এই সব পুস্তক তোতাপাখীর মত পড়ান হয়, তাহাতে শিশুচরিত্রে উন্মেষিত না হইয়া স্তিমিতশক্তি হইয়া পড়ে।

শিশুচরিত্রের প্রথম ও প্রধান লক্ষণ এই যে অল্পবয়স্ক বালক-বালিকারা গল্প শুনিতে ভালবাসে। সন্ধ্যার আঁধারে বদ্ধ গৃহে ঠাকুরমা, দিদিমা, ঠানদিদি, রাঙাদিদি ও নূতন বধূরা যে সব গল্প, ছড়া রূপকথা ও হেঁয়ালি বলিয়া যান, তাহাতে নূতনত্ব ও বৈচিত্র্য অনেক। ছোট ছোট শিশুরা তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়া নিদ্রাজড়িত নয়নে ছোট ছোট একটা 'হুঁ' দিতে দিতে কখন যে তাহাদের কোলে লুটাইয়া পড়ে, তাহা তাহারাই জানে না। শিশুরা চোখের দেখা ও কানের শোনা এই দুইটীরই পক্ষপাতী। কিন্তু চোখের দেখা পুস্তকের লাইন দেখা নয়, ইহা ছবি দেখা। একটা গরুর বর্ণনা অপেক্ষা সেই গরুটাই তাহারা সশরীরে দেখিতে চাহিবে। মনের ভিতরেও তাহারা অস্পষ্ট ছবি আঁকিয়া যায় কেননা তাহাদের কল্পনা শক্তি খুবই প্রবল। মানসিক ভাবরাজি তাহাদের খুব তীক্ষ্ণ,—ভয়, প্রীতি, স্নেহ, বিস্ময়, আনন্দ, দয়া প্রভৃতি সমস্ত মানসিক বৃত্তিগুলিই অবিকৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া এত তীক্ষ্ণ। তাই কবি

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহাদের 'trailing clouds of glory' বলিয়াছেন। শিশুরা কান দিয়া শুনিতে চায়— সঙ্গীত, ছন্দ, মিত্রাক্ষর রচনা, লীলায়িত গতি কবিতা; আর চোখ দিয়া দেখিতে চায়— বিচিত্র রেখার বিচিত্র অঙ্কন, ছবি, বর্ণচিত্র, আকার দেওয়া ভাব। তাহাদের নির্ম্মল মনটা গোধূলির আলো—আঁধারে ভরা; তাহারা কি চায় ও কি না চায়—তাহা তাহারাই ঠিক ভাল করিয়া জানে না। তাহাদের মন কখনো সচল রেখায় চলে না। আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের ভুবনবিখ্যাত ক্রেস্কোগ্রাফে শিশুচিত্তের অবস্থা আঁকিলে ঐ রকম একটা হিজি-বিজি গ্রাফ তৈরি হইত। তাই যে-সব কবিতায় তরঙ্গায়িত ছন্দ ও সুললিত শব্দ সমাবেশ আছে, সেগুলি শিশুদের বড় আদরের; আর যে সব কাহিনীতে অদ্ভুতত্ব ও চিত্রপূর্ণ ঘটনা আছে, সেগুলিও তাহাদের বড় আদরের।

গল্পে তাহারা যা শোনে, তাহা সহজে ভোলে না। কারণ গল্পের ঘটনাগুলি ছবির মত তাহাদের মনের সুকুমার পটে আঁকিয়া যায়। সেই জন্য অনেক পাশ্চাত্য প্রাথমিক শিক্ষায়তনে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যবিদ্যা প্রভৃতি গল্পের ভিতর দিয়াই শেখানো হয়। ইতিহাসের মূল ঘটনাগুলি আবার অনেক সময়ে অভিনয় করিয়া দেখানো হয়। হুমায়ুন ও শেরসাহের নীরস ঘটনাগুলি সরস করিবার জন্য একজন ছাত্র হুমায়ুন ও অন্য একজন শেরসাহ সাজিয়া ব্যাপারটা অভিনয় করিয়া যায়। ইহাতে হুমায়ুন ও শেরসাহের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের রাজত্বের ঘটনাবলীও বেশ স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আমেরিকার অনেকস্থলে গ্রামোফনের প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু আমরা আমাদের স্বদেশী রূপকথারই পক্ষপাতী।

রূপকথা—অর্থাৎ কথা বা কাহিনী যেখানে রূপ ধরিয়া মূর্ত্ত হইয়া ফুটিয়াছে। রূপের ভিতর দিয়াই ছেলে মেয়েরা গল্প শুনিতে মজিয়া যায়। তাই God save the king কবিতার আবৃত্তি বাঙ্গালী জীবনে নিরর্থক। পুস্তককারের প্রথম হইতেই চেষ্টা—বাঙ্গালীদের পরম রাজভক্ত প্রজা করিয়া তোলা। সে চেষ্টা কতদূর ফলবতী হইয়াছে বলিতে পারি না; তবে এই মাত্র জানি, শিশু জীবনে ঐ গানটী না শিখিয়া ডি, এল, রায়ের 'আমার জন্মভূমি' বা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরং' শিখিলে বাঙ্গালী বালকের জীবন সার্থক, মঙ্গলময় ও পুণ্যশ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিতে পারে। শিশু জর্জ ওয়াশিংটন চেরীগাছের ডাল কাটিয়াও পিতার কাছে নির্ভীকভাবে দোষ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী বালকের পক্ষে সত্যবাদিতার এই নজীর সম্পূর্ণ নিরর্থক। সত্যের জন্য বালক প্রহ্লাদ যাহা করিয়াছিল বা

শ্রীরামচন্দ্র যাহা করিয়াছিলেন তাহার মূল্য ও সার্থকতা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। ভূতের রোমাঞ্চকর গল্প শুনিয়া শুনিয়া বুড়া বয়সেও আমাদের গাত্র-চর্ম্ম রোমাঞ্চই রহিয়া গিয়াছে, হাম্বা-রব শুনিয়াও দিনের মধ্যে অনেকবার আমাদের মূর্চ্ছা উপস্থিত হয়।

রূপকথার কয়েকটা বিভাগ মোটামুটী ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে—

(১) কাল্পনিক।
(২) পৌরাণিক।
(৩) ঐতিহাসিক ও
(৪) জীবন-চরিত বিষয়ক।

এই চারপ্রকার রূপকথার মধ্যে নিতান্ত শিশুদের জন্য প্রথমটীরই শ্রেষ্ঠতা দেওয়া উচিত। রাজপুত্র দুধের মত সাদা ঘোড়ায় চড়িয়া বিজন বনের নিবিড় আঁধারের মধ্যে একাকী নির্ভয়ে ছুটিয়াছেন, টুক্‌টুকে ঘুমন্ত রাঙা বউ পাবার জন্য নয় স্যর গ্যালাহাডের মত জীবনের আদর্শের সন্ধানে। কারণ পরিণত বয়সেও শিশু টুক্‌টুকে রাঙা বউএর মধুময় স্বপ্নটা মন হইতে তাড়াইতে পারে না। আলতার মত গাল, নবনীর মত ফুটন্ত কোমল দেহ, ফুলের মধু খাওয়া মুখ, মেঘের মত চুল, সোণার কাটি দিয়ে ঘুম পাড়ানো ও রূপার কাটি দিয়ে সেই ঘুমন্ত রাজকন্যার সুবর্ণ পালঙ্কে নিদ্রাভঙ্গ,—এ সবের যথারীতি পরিবর্জ্জন করিতে হইবে। আমাদের ঠাকুরমা, দিদিমা, ঠান্‌দিদিরা তাঁহাদের চিরপুরাতন অথচ চির তরুণ গল্পগুলি হইতে এই সব রসাল অংশ বাদ দিতে চাহিবেন না জানি কিন্তু একটা জাতিকে মানুষ হইতে হইলে অনেক পুরাণো জিনিষ ভুলিতে হয় ও নূতন জিনিষের সম্যক্ গ্রহণ করিতে হয়। হাজার হাজার ভীষণ দর্শন ভৈরব রুদ্র রাক্ষস,—তাহাদের প্রাণ আছে একটী ছোট ভোমরার ভিতর; সে ভোমরাটী প্রমোদ সরোবরের যতই তলায় থাক ও কাশির কৌটার মত যতই গোলক-ধাঁধার মধ্যে সুরক্ষিত থাক, একবার কোন ক্রমে সেটাকে ধরিয়া 'পাঁশ পেড়ে কেটে ভুঁয়ে না রক্ত ফেললেই' অমনি কেল্লা ফতে;—হাজার হাজার রাক্ষস এক নিমেষে ধরাশায়ী হইবে। বুড়া বয়সেও এইরূপ রাক্ষস মারা আমাদের খুব সোজা কাজ হইয়া থাকে! শাঁকচুন্নি, পেত্নী, ভূত, ব্রহ্মদৈত্য কবন্ধ প্রেত, ডাইনী—বাঙ্গলার দিবস রজনী ভরিয়া বর্ত্তমান। তাহাদের এ পর্য্যন্ত মারা গেল না, যদিও রাক্ষস মারা কত সোজা!

এইরূপ অনেক সুন্দর রূপকথা শিশুজীবন হইতেই আমাদের মানসিক

বিকার উপস্থিত করে। ইহাদের পরিবর্ত্তনের ভার নবীনা বধূদের উপর দিলে আগামী বংশীয়েরা আবার মানুষ হইয়া উঠিবে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও জীবনচরিত-বিষয়ক গল্পগুলি শিশুদের নিকট সরস ও কৌতুহলোদ্দীপক করিয়া তুলিতে হইবে। আমাদের বর্ত্তমান রূপকথার যে বিরাট saga বা 'মহাবংসো' আছে তাহার এখনও ভাল করিয়া আলোচনা করা হয় নাই। জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় এই কথাসাহিত্য ইতস্ততঃ ভাসমান শৈবাল-দলের মত অবহেলায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। বাঙ্গালার আকাশ বাতাস, স্নিগ্ধ সন্ধ্যা, উজ্জ্বল প্রভাত, হাসি অশ্রু, জয়-পরাজয় এই সব সামান্য কথা সাহিত্যের সঙ্গে চির বিজড়িত রহিয়াছে। যখন শীতের সুদীর্ঘ অলস সন্ধ্যাগুলি ঝিল্লীমন্দ্রে মুখরিত হইয়া উঠে, স্বর্গের প্রফুল্ল কোমল দেবদূতগুলি যখন সারাদিনের আমোদ কোলাহলে শ্রান্ত হইয়া স্নেহময়ীর অঞ্চল লগ্ন হইয়া বসিয়া থাকে, যখন সংসারের সব কাজ সারা হইয়া গিয়া একটী নিবিড় শান্তির জন্য সমস্ত চিত্ত ক্ষুধিত ব্যথাতুর হইয়া পড়ে,—তখন আমাদের স্নেহময়ীরা তাঁহাদের তরুণ জীবনের অরুণ স্বপ্নের মঞ্জুষাগুলি গাঢ় অনুরাগভরে একে একে উন্মোচিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহাদের এই স্নেহের দান লাভ করিয়া আমরা সেই দানের উপযুক্ত হইতে পারি নাই। 'এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রাণী'—এই রকম সরল ভাবে গল্প আরম্ভ করিয়া আমরা কত মতিমহল, শীষমহল, দেওয়ান-ই-খাস্, আরাম বাগ কল্পনায় পার হইয়া যাই; কত মুগ্ধা, কত অভিমানিনী, কত রূপসী আমাদের শিশুচিত্ত কমল আগামী যৌবনের মোহন পূর্ব্বরাগে অনুরঞ্জিত করিয়া যায়; কত যুদ্ধ, কত সন্ধি, কত তেপান্তরের মাঠ বায়স্কোপের ছবির মত শব্দের নির্ঝরে আমাদের কল্পনা চক্ষে প্রতিবিম্বিত হইতে থাকে; আর সেই জুজুবুড়ী,—অমনি আমাদের মুখে চোখে ভয়ের অন্ধকার, হৃদয়ের দারুণ শঙ্কা, ঠিক কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের দশা—

'সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখংচ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে॥"

বৈষ্ণব কবিদের 'হিয়া দুরু দুরু পরাণ কাঁপনি!'

স্বীকার করি, সব দেশের কথাসাহিত্যেই অলৌকিক ও অবস্থা কাহিনীর সমাবেশ আছে। কিন্তু সে-সব গল্প ছোট ছেলেমেয়েদের ভয় দেখাইবার জন্য

প্রায় কথিত হয় না। আমাদের গৃহের নবীনা মাতারা কাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলে শিশুদের দুরন্তপনা সহিতে না পারিয়া তাহাদিগকে অযথা জুজুর হাতে তুলিয়া দিতে চান; বাস্তবিকই জুজু মহাশয় তখন হইতেই শিশুচিত্তে জগদ্দল-পাথরের মত চাপিয়া বসেন। তাই পরিণত বয়সেও আমরা আশে পাশে জুজু দেখিতে পাই। স্বাদেশিকতা শুধু লেখাবাজি বা বক্তৃতার ফোয়ারায় প্রকাশ করিবার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমাদের দেশে স্বাস্থ্যময়,পূর্ণায়ত,সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর শিশুর প্রয়োজন হইয়াছে। রূপকথায় কথিত সাহসী রাজপুত্রের মতই বিজন বনের গহন অন্ধকারে একলা ঘোড়া ছুটাইয়া তাহাদের চলিতে হইবে—ঘুমন্ত রাজকন্যার তরুণ বিম্বাধরে অনুরাগের প্রথম চুম্বনটী দিবার জন্য নয়,—সেই অনন্ত পথ, সেই তিমির-সঘন রাত্রি, সেই দুর্ব্বার বিপদ, সেই মায়া, সেই ভোজবাজি,—সেই সব উত্তীর্ণ হইয়া নবরুচিরকান্তি অরুণ প্রভাতে সত্য, শিব ও সুন্দরকে বরণ করিয়া লইবার জন্য! রূপকথা কেবল তখনি রূপরসে ভরিয়া উঠিবে, নহিলে নয়। রূপকথা আমাদের অন্তঃপুরের প্রাণশক্তি; রূপকথায় আমাদের দেশমাতৃকার স্বরূপ-প্রকাশ, রূপকথা আমাদের জন্মকোষ্ঠী। শিশুদের নবীন চিত্তের এই স্বাস্থ্যসম্পৎময় স্বদেশী উপাদানটীর প্রতি আর আমাদের উদাসীন হইলে চলিবে না।

গৌতমবুদ্ধ

[অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী]

(ভূপাল রাজ্যের অন্তঃপাতী সাঞ্চীশৈলবিহারের স্তূপ মধ্যে প্রাপ্ত প্রাচীন লিপি ও মৃত্ত প্রভৃতির আভাষ অবলম্বনে লিখিত।) *

(১)

আন্দাজ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৬২ অব্দে গৌতমবুদ্ধ জন্ম পরিগ্রহ করেন। নেপাল তরাই প্রদেশের প্রাচীন নগর কপিলবাস্তুর নিকটে তাঁহার জন্ম হয়। বোধগয়ার (বুদ্ধগয়া) পিপ্পল বৃক্ষের (বোধিদ্রুমের) তলে বোধলাভ (সম্বোধিলাভ) করিয়াই তিনি 'বুদ্ধ' এই উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। তাহার পূর্ব্বে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' এই নামেই পরিচিত ছিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার আরও কয়েকটী নাম ও উপাধি ছিল; যথা—'শাক্যমুনি,' অর্থাত শাক্যকুলের মুনি; 'সিদ্ধার্থ,' অর্থাৎ যিনি ইষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন; 'তথাগত,' অর্থাৎ যিনি সত্য লাভ করিয়াছেন বুদ্ধ এই শেষোক্ত নামেই সর্ব্বদা নিজের উল্লেখ করিতেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে লিখিত আছে যে বোধিসত্ত্ব কপিলাবস্তুতে জন্মগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে নানাভাবে নানা স্থানে দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব

---

*Sir John Marshall Kt. মহোদয়ের 'Guide to Sanchi' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্ট অবলম্বন করিয়া এই প্রবন্ধের অধিকাংশই লিখিত হইল। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, সিদ্ধান্তবারিধি রায় সাহেব মহাশয়ের 'বিশ্বকোষ' ও শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম্, এ, মহাশয়ের 'সারনাথের ইতিহাস হইতেও স্থানে স্থানে অনেক কথা সংকলন করিয়াছি। তাহা ছাড়া প্রাচীন পালি ও বৌদ্ধবিষয়ক সংস্কৃতগ্রন্থ হইতেও অনেক কথা লইতে হইয়াছে। সুতরাং আমি উক্ত সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া—ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি, শ্রীযুক্ত মার্শেল সাহেব মহোদয়ের পূর্ব্বেও যাঁহারা সাঞ্চীর ইতিকীর্ত্তির কথা লিখিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলের মতামত তুলনা করা বা বিবেচনা করা মোটেই আমার অভিপ্রেত নহে; সুতরাং তাহা পরিত্যাগ করিয়াছি। এমন কি, সাঞ্চীর স্তূপমালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের নিদর্শনগুলিরও উল্লেখ হইতে বিরত হইয়াছি; কাজেই একটা জটিল টীকাটিপ্পনী দিয়া জমাট জীবনচরিত লিখিবার চেষ্টা করি নাই, তাহা পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। মহাপুরুষের জীবন কিরূপে মহামহিমান্বিত হইয়া প্রকাশ পায়, এবং তাহাতে দেশের ও দশজনের কি উপকার হয় ইহা দেখাইয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। গৌণভাবে ইতিহাসের তথ্য জানাও আবশ্যক বটে কিন্তু তাহার উপর আমি বেশী জোর দেই নাই। লেখক।

জন্মে তিনি তুষিত-সর্গে জন্মিয়াছিলেন ; সেই সময়ে দেবগণ তাঁহাকে নর-লোকের পরিত্রাতারূপে জন্মগ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি সেই প্রস্তাব স্বীকার করিবার পূর্ব্বে কোথায় কোন সময়ে কোন বংশে কাহার গর্ভে আবির্ভূত হইবেন এবং কবেই বা তাঁহার জীবনান্ত হইবে—এই সকল কথা স্থির করিয়া লইবার আবশ্যকতা মনে করিলেন। যথাকাল উপস্থিত হইলে তিনি সাব্যস্ত করিলেন, অন্যান্য বুদ্ধের ন্যায় তিনিও জম্বুদ্বীপের অর্থাৎ ভারত-বর্ষের মধ্যদেশে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিবেন ; কপিলবাস্তুর শাক্য-কুলের শুদ্ধোধন তাঁহার জনক ও মায়া (বা মায়াদেবী) তাঁহার জননী হইবেন এবং তাঁহার ভূমিষ্ঠ হইবার সাতদিন পরেই জননী মায়াদেবী মানবলীলা সংবরণ করিবেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি তুষিত-সর্গ পরিত্যাগ করেন এবং মায়াদেবীর গর্ভে প্রবিষ্ট হয়েন। মায়া স্বপ্ন দেখিলেন যে ভাবী বুদ্ধ এক শ্বেত হস্তীর কলেবর ধারণ করিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইতেছেন। মহিষী স্বপ্নের কথা রাজার গোচর করিলে, রাজা শুদ্ধোদন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ডাকাইয়া সেই স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলিলেন যে রাণী অন্তঃসত্বা হইয়াছেন এবং তাঁহার গর্ভজাত শিশু রাজচক্রবর্ত্তী বা বুদ্ধ হইবেনই হইবেন। গর্ভাবস্থায় চারিজন দিক্‌পাল বোধিত্ব ও মায়া দেবীকে সকল রকম অমঙ্গল হইতে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কপিলবাস্তুর সমীপবর্ত্তী লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উদ্যানমধ্যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেন ; মায়াদেবী প্রসবকালে এক শালবৃক্ষের নিম্নে দণ্ডায়মানা ছিলেন ; প্রসূতি ধরিয়া দাঁড়াইতে পারেন এই জন্য ঐ গাছের একটী শাখা নত হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়া ছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ সকলেই আসিয়া তথায় উপস্থিত ছিলেন এবং চারিজন দিক্‌পাল জননী মায়াদেবীর দক্ষিণ দিক্ হইতে সন্তানকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। ভূমিষ্ঠ হইলে দেখা গেল সন্তানের শরীরে ভাবী মাহাত্ম্যব্যঞ্জক বত্রিশটী মহাপুরুষ-লক্ষণ (মহাব্যঞ্জক) এবং অপরাপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ লক্ষণ সমূহও (অনুব্যঞ্জক) বিদ্যমান আছে। জন্মিবামাত্রই নবকুমার সোজা হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন এবং শতবার পদবিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"আমি জগতের শ্রেষ্ঠ"। ঠিক বুদ্ধ যেই মুহূর্ত্তে জন্ম পরিগ্রহ করেন, সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহার ভাবী সহধর্ম্মিনী রাহুলজননী যশোধরা, তাঁহার সারথি ছন্দক, প্রিয় অশ্ব কন্থক, ক্রীড়াসহচর কালুদায়ী এবং প্রিয়তম শিষ্য আনন্দও জন্মলাভ করেন।

বোধিসত্ত্বের জন্মদিনে স্বর্গে তেত্রিশ দেবতার মহোৎসবের পরাকাষ্ঠা দেখা গিয়াছিল। ঋষি অসিত এই মহনীয় দিনের মহোৎসবের সংবাদ পাইয়া দিব্যদৃষ্টির বলে বলিয়াছিলেন যে এই শিশুই ভবিষ্যৎ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কৌণ্ডিণ্য নামীয় অপর এক যুবক ব্রাহ্মণও এই প্রকার ভবিষ্যদ্ বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ব্রাহ্মণ ভবিষ্যদ্‌বাদী জ্যোতিষিকগণ সন্দেহ করিয়াছিলেন যে এই নবজাত কুমার কালে চক্রবর্ত্তী হইবেন কি বুদ্ধ হইবেন তাহার নিশ্চয় নাই। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছিলেন যে কুমার যদি সংসারে থাকেন তবে নিশ্চয়ই রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন এবং যদি সংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তবে নিঃসন্দেহ বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। রাজা শুদ্ধোধন পুত্র 'রাজচক্রবর্ত্তী' হয়েন ইহাই কামনা করিয়াছিলেন ; কিন্তু কি কারণে সংসার পরিত্যাগ করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, রাজা সকলকেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। উত্তর পাইলেন—চারিটি দৃশ্য—বৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, মৃত ও সন্ন্যাসী এই চারিব্যক্তির দর্শনেই কুমারের বৈরাগ্য জন্মিবে। তদবধি শুদ্ধোধন সতর্ক হইলেন ; যাহাতে পুত্রের দৃষ্টিপথে কোন বৃদ্ধ বা পীড়িত ব্যক্তির দৃশ্য না পড়ে কিংবা কোন শব বা সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া না যায়, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিলেন এবং পার্থিব বস্তুতে যাহাতে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয় সেই জন্য নিজে যতদূর পারিলেন যত্নবান্ হইলেন এবং যতদূর বা পরের সাহায্যে হওয়া সম্ভব তাহাও করিতে ত্রুটী করিলেন না। কথিত আছে, রাজা শুদ্ধোধন একদিন—সম্ভবতঃ 'সক্রোত্থান' পর্ব্ব (ইন্দ্রধ্বাদশী কৃষি সংক্রান্ত পর্ব্ববিশেষ) উপলক্ষে কৃষিগ্রাম পরিদর্শনে বালক বুদ্ধকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়াছিলেন ; এবং একটী জামগাছের তলায় নিজের রথে বুদ্ধকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেইখানে ধাত্রীরা কিছুকালের জন্য বুদ্ধকে ছাড়িয়া যায় ; বুদ্ধ উঠিয়া পদ্মাসনে উপবিষ্ট হয়েন, অবিলম্বেই তাঁহার সমাধি হয়। এই তাঁহার প্রথম সমাধি। যতক্ষণ তিনি সমাধিমগ্ন ছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয়, বৃক্ষছায়া ততক্ষণ তাঁহার উপরিভাগে সমভাবে স্থির হইয়া ছিল। ইহা হইতে বুঝা গেল যে তাঁহার ভাবি জীবনের উন্নতির বীজ বাল্যকালেই তাহাতে নিহিত ছিল।

বহুকাল পূর্ব্ব হইতে কোলিয় নামক রাজবংশের সহিত শাক্যকুলের বিবাদ বিসংবাদ চলিয়া আসিতেছিল। এই বিবাদের নিঃশেষ ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত কোলিয়-বংশসম্ভূতা সুপ্রবুদ্ধের কন্যা যশোধরার সহিত ১৬ ষোল বৎসর বয়ঃক্রম

কালে বুদ্ধদেবের বিবাহ দেওয়া হয়। কথিত আছে বুদ্ধদেব সেই সময়ে অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্যসম্পন্ন যুবক ছিলেন; ধনুর্ব্বিদ্যায় কেহ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না; দৈহিক বিক্রমে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; নানা কলাবিদ্যায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। শৈশবের ভবিষ্যদ্‌বাদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শুদ্ধোধন পুত্রকে সর্ব্বদা নানাপ্রকার ভোগবিলাসের সামগ্রীতে পরিবেষ্টিত করিয়া রাখিতেন—যাহাতে পুত্র বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়া নিতান্ত বিষয়াকৃষ্ট হইয়া পড়ে দিবারাত্র সেই চিন্তা ও সেই চেষ্টাই করিতেন; এবং যাহাতে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে পূর্ব্বলিখিত দৃশ্যচতুষ্টয়ের একটীও না পড়ে সেইজন্য অত্যন্ত সাবধান থাকিতেন। পাছে এই সকল দেখিয়া শুনিয়া কুমারের বৈরাগ্যোদয় হয় এবং সংসার ছাড়িয়া সন্ন্যাসে মন দেয় এই চিন্তাই তাঁহার বলবতী হইয়া উঠে। কিন্তু যতই যাহা হউক পর পর কয়েকবার রাজকুমারের প্রাসাদের আরামোদ্যানে রথারোহণে ভ্রমণকালে, দেবগণ তাঁহার সম্মুখে সেই রকমের বিষাদ দৃশ্যাবলিই উপস্থিত করিয়াছিলেন; কখনও জরাজীর্ণ বৃদ্ধলোক, কখনও শীর্ণকলেবর ব্যাধিগ্রস্ত লোক কখনও আবার শবাকার গতপ্রাণ মানবদেহ (মৃত) তাহার সম্মুখে পতিত হইল। এই সকল বিষাদ দৃশ্য দেখিয়া যুবকের হৃদয় গলিয়া গেল; তিনি করুণার্দ্রহৃদয়ে এই সকলের অর্থ ও কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ক্রমে জরাব্যাধি ও মৃত্যুসংক্রান্ত সত্য নির্দ্ধারণ করিয়া বুদ্ধদেব নিতান্ত অধীর ও শোকাকুল হইয়া উঠিলেন। অতঃপর চতুর্থ দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল—সুপবিত্র সৌম্যকায় শান্ত দান্ত ও সংযত ব্রহ্মচারী ভিক্ষুকের মূর্ত্তি। দেখিয়াই তরুণ তাপসের হৃদয়ে গভীর সংস্কার বদ্ধমূল হইল। ভিক্ষুর সন্ন্যাসমূর্ত্তিই যেন নিজ হইতে তাঁহাকে বলিয়া দিল—সংসারে যে সকল দারুণ দুরাবস্থার দৃশ্য দেখিয়াছ, যদি ইহার উপরে উঠিয়া থাকিতে চাও, তবে সংসার ছাড়িয়া থাকা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অবিলম্বেই তিনি ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন সমাধি অবলম্বন করিতে মনঃস্থ করিলেন। একদিন রাজপ্রসাদের নিদ্রাগত পরিচারিকা নারীবর্গের ন্যাক্কারজনক উচ্ছৃঙ্খলদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার সংকল্প আরও দৃঢ় হইল; তিনি রাত্রিকালে নিদ্রাবস্থাতেই নিজ পুত্র ও পরিবারের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিঃশব্দে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। ইহাই বুদ্ধদেবের মহাপ্রস্থান বা প্রব্রজ্যা (মহাবিনিষ্ক্রমণ)। এইরূপে ২৯ উনত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধদেব সত্যের অনুসন্ধানে সংসার হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হয়েন। তাঁহার প্রিয় অশ্ব কন্থকে আরোহণ করিয়া তিনি নগর অতিক্রম করিলেন;

পাছে নগরের লোক কোন প্রকার শব্দে জাগরিত হইয়া উঠে এইজন্য দেবতারা সকাল অশ্বের ফোঁস ফোঁস শব্দ নিবারণ করিয়া তাহার পদ চতুষ্টয় ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে অতি সত্বর নগরে বাহির করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে দুর্ম্মতি মার (কন্দর্প বা কামদেব) গৌতমের অনুসরণ করতঃ তাঁহাকে নিখিল জগতের রাজচক্রবর্ত্তী পদের প্রলোভন দেখাইয়া লক্ষভ্রষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিল। কিন্তু, বলা বাহুল্য তাহার সেই চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হইল।

অদূরে অনোমা নদীর পরপারে পৌছিয়া গৌতম তাঁহার বিশ্বস্ত সারথির হস্তে নিজের অলঙ্কারপত্র সমস্ত প্রত্যর্পণ করিলেন। পরে স্বহস্তস্থিত তরবারির দ্বারা নিজের কেশগুচ্ছ কাটিয়া লইয়া শিরস্ত্রাণের সহিত তাহা ঊর্দ্ধে আকাশে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"যদি আমি ভাবী বুদ্ধই হই—ইহাই ঠিক, তবে এই কেশদাম ঊর্দ্ধেই অবস্থান করুক নতুবা অচিরাৎ শিরস্ত্রাণের সহিত ইহা ভূপতিত হউক"। বলা বাহুল্য কেশরাশি নিমেষ মধ্যে ঊর্দ্ধে উধাও হইয়া গেল এবং সুবর্ণ পুটিকার মধ্যে স্বর্গের এয়ত্রিংশদেবতার সমীপে নীত হইয়া রহিল। অতঃপর দেবদূত ঘটিকার ব্যাধের বেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে বোধিস্বত্ত্ব তাহার সহিত নিজের পোষাক পরিচ্ছদ বদলা বদলি করিয়া এবং সংসার ত্যাগের চিহ্ন স্বরূপ ঘোড়া লইয়া সারথিকে ফিরিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া একাকী পদব্রজে রাজগৃহের অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় রাজা বিম্বিসার অবিলম্বে আসিয়া তাহার সংবর্দ্ধনা করিলেন; এবং নিজ রাজপদ পর্য্যন্ত গৌতমবুদ্ধকে ছাড়িয়া দিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বোধিস্বত্ত্ব রাজ্যগ্রহণে অসম্মত হইয়া তাঁহার কাছে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলে আমি পূর্ণ মনোরথে স্বয়ং আপনার রাজ্যে আবার প্রত্যাগমন করিব। তথা হইতে গৌতম উরুবিল্বার (পালি উরুবেল) পথে প্রস্থান করিলেন। উরুবিল্বা মগধের পুণ্যভূমি গয়া নগরীর সন্নিকটে কোন গ্রাম বিশেষ। এইখানে বোধিস্বত্ত্ব কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিয়া নিতান্ত বিশীর্ণাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। ছয় বৎসরকাল এইরূপ তপশ্চর্য্যা চলিল। তখন বুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন যে তপস্যায় শরীরের কৃশতা সাধন দ্বারা জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব আবার তিনি পূর্ব্ববৎ ভিক্ষুর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহার পাঁচজন অনুচর (পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুগণ) তাঁহার প্রতি অনাস্থা পরায়ণ হইয়া অশ্রদ্ধায় তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং কাশীর সন্নিধানে মৃগদাবে (বর্ত্তমান 'সারনাথ') গিয়া অবস্থান করেন। বোধিস্বত্ত্ব নৈরঞ্জনা নদীরতীরে গমনপূর্ব্বক নিকটস্থ

কোন গ্রামবাসীর কন্যা সুজাতার হস্তে সেই দিবস প্রাতরাশ ভক্ষণ করেন ভক্ষণান্তে সুজাতা যে সুবর্ণপাত্রে অন্নাদি আনিয়া দিয়াছিলেন তিনি তাহা নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "যদি অদ্যই আমি বুদ্ধ হইতে পারি তবে এই ভোজনপাত্র স্রোতোজলে উজান বাহিয়া উঠুক ; নতুবা এই দণ্ডেই জলধিমগ্ন হউক।" আশ্চর্য্য যে সেই পাত্র কিয়ৎকাল স্রোতের বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া জলমগ্ন হইল এবং নাগরাজ কালের বাসভূমিতে চলিয়া গেল।

সেই দিবস সায়ংকালে বোধিস্বত্ব বোধগয়ায় পিপ্‌পলীবৃক্ষের অভিমুখে গমন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তদবধি সেই বৃক্ষ 'বোধিদ্রুম' নামে অভিহিত হইতে লাগিল। পথে স্বস্তিক (পালি, সাত্থির) নামে এক ঘাস-বিক্রেতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহার নিকট বুদ্ধ আট আটি ঘাস লইলেন এবং বোধিদ্রুমের পাদদেশে দণ্ডায়মান হইয়া চারিদিক অবলোকন করতঃ ঐ বৃক্ষের পূর্ব্বভাগে সমস্ত ঘাসমুষ্টি ছড়াইয়া দিলেন। পরে তাহার উপর বসিয়া বুদ্ধ বলিলেন,—"যদিও আমার অস্থি, চর্ম্ম, মাংস সমস্ত ক্ষীণ হইয়া যায়, যদিও আমার শরীরের শোণিত জীবনীশক্তির বিলোপসাধন করিয়া শুষ্ক হইয়া পড়ে, তথাপি আমি যতদিন না সত্যজ্ঞানের অধিকারী হইয়া বহুকল্পেও সুদুর্লভ সেই সংবোধি লাভ করিতে না পারি, ততদিন এই যে বসিলাম, বসিলাম ; এই পরিগৃহীত আসন আর পরিত্যাগ করিব না।" বলা বাহুল্য, ইহার পরেই দুরন্ত ও পরের অভ্যুদয়ে কাতর মন্মথের আক্রমণ ও প্রলোভন আরও বাড়িতে লাগিল ; কন্দর্প নানা উপদ্রবের অবতারণা করিয়াও তাঁহাকে উদ্দেশ্যবিমুখ করিতে পরান্মুখ হইল না। তাহার অসুর প্রকৃতিক দলবলের ভীষণ অত্যাচার ও নিদারুণ উৎপাতের ভয়ে বোধিসত্ত্বের পার্শ্বচর দিকপাল দেবগণও পলাইয়া গেলেন। কেবলমাত্র 'তথাগত' সেইখানে একাকী নিজের সিংহাসনে স্থির ও নিশ্চলভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। দুরাচার মার ভীষণ বাত্যা-প্রবাহিত করিয়াও তাহার নিষ্কম্পিত শরীরকে কম্পিত করিতে পারিল না। তাঁহার উপরে অবিশ্রান্ত উপলখণ্ড, তীক্ষ্ণ অস্ত্রশস্ত্র জ্বলন্ত অঙ্গার ও ভস্মরাশির অভিবর্ষণ হইতে লাগিল ; তথাপি তিনি কোনমতেই বিচলিত হইলেন না বা তৎপ্রতি ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সেইগুলি তাঁহার শরীর স্পর্শ করিবার পূর্ব্বেই কোমল কুসুমে পরিণত হইয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া সকলেই অবাক! বোধিসত্ত্ব তখন সিদ্ধির আর দেরী নাই জানিয়া জয়লাভের মহানন্দে ধরিত্রীর দোহাই দিলেন এবং নিজের আসনে বসিয়া নিজের কাজ

করিবার অধিকার তাঁহার নিজেরই আছে এই কথা জানাইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য তাঁহাকে আহ্বান করিলেন। দেবী ধরিত্রী মহাশব্দে সেই আহ্বানের উত্তর দিলেন। দুরাচার মন্মথের সৈন্যগ্রাম সেই শব্দে ভয়াকুল হইয়া লজ্জানত মুখে প্রস্থান করিল। দেবগণ উপস্থিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—'জয় সিদ্ধার্থের জয়! এতদিনে দুর্ম্মদ কন্দর্পের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল!' অবিলম্বে নাগলোক প্রভৃতির সমস্ত প্রাণীরা আসিয়া সিদ্ধার্থের জয়গান করিতে লাগিল। তখন সায়ংসূর্য্য অস্তমিতপ্রায় ; বোধিসত্ত্ব প্রকৃতই শত্রুদল পরাজয় করিলেন এবং সেই রজনীযোগেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইলেন। চিরবাঞ্ছিত সংবোধি তাঁহার করায়ত্ত হইল। রজনীর প্রথম প্রহরে, তিনি জাতিস্মর হইয়া পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের সমস্ত জ্ঞানলাভ করিলেন ; দ্বিতীয় প্রহরে জীবজগতের যাবতীয় অবস্থা তাঁহার বিদিত হইয়া গেল ; তৃতীয় প্রহরে, কার্য্যকারণ পরম্পরা সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইল ; এবং রজনী প্রভাত হইলে কোন বস্তুর কোন বিদ্যাই তাঁহার অবিদিত রহিল না ;—তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইলেন।

এইরূপ সংবোধি লাভ করিয়া উদ্‌বুদ্ধ বুদ্ধদেব ৪৯ দিন উপবাস করিলেন। সুজাতা তাঁহাকে পূর্ব্বদিন যে অন্নপ্রদান করিয়াছিলেন তাহার বলেই অমানুষিক শক্তিতে এতদিন তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই। এই সুদীর্ঘ সাত সপ্তাহকাল বুদ্ধ নানাস্থানে যাপন করিলেন। প্রথমতঃ বোধিদ্রুমের তলে বা নিকটে ;—এইখানে তিনি তাঁহার মুক্তির ফলভোগ করিলেন এবং অভিধর্ম্ম পিটকের সমগ্রাংশ প্রচার করিলেন ; অতঃপর অজপালের ন্যগ্রোধ (বটবৃক্ষ) মূলে, এইখানে সেই সদ্ধর্ম্মের শত্রু মারের রতি, প্রীতি ওতৃষ্ণা নাম্নী তিন কন্যা তাঁহাকে লোভের ফাঁদে ফেলিবার প্রয়াস করিয়াও সফলকাম হইতে পারে নাই ; তৃতীয়তঃ মুচিলিন্দ (মুচলিন্দ) বৃক্ষের ছায়ায় এইখানে নাগরাজ মুচিলিন্দের ফণা তাঁহাকে বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা করিয়াছে, এবং সর্ব্বশেষে, রাজায়তন বৃক্ষের নিম্নে,—এইখানে সপ্তম সপ্তাহের শেষদিনে ত্রপুষ ও ভল্লিক নামীয় দুই সহোদর তাঁহাকে আহারার্থ যবের রুটী ও কিছু মধু আনিয়া দেয়। এই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন, বুদ্ধদেবের কাছে এমন কোন পাত্র না থাকায় চারিজন দিকপাল তাহাকে তৎক্ষণাৎ চারিটী পাথরের বাটী আনিয়া দেয়। তথাগত স্ব আজ্ঞায় তদ্দণ্ডে সেই চারিটী প্রস্তর পাত্রকে একটিতে পরিণত করিয়া তাহাতেই অন্নগ্রহণ পূর্ব্বক ভক্ষণ করেন। বণিকদ্বয় তাঁহার প্রতি নিজেদের সম্পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করিয়া ভক্তিভরে তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার প্রার্থনা

জানাইলেন। বুদ্ধও তাহা পূরণ করিয়া অনতিবিলম্বে তাহাদিগের দুই জনকে বৌদ্ধসংঘের প্রথম উপাসকরূপে দীক্ষিত করিলেন।

(আগামীবারে সমাপ্য)

মায়ের ডাক

[শ্রীসত্যকুমার মজুমদার বি, এ]

১

শিবপুরের হারাণ বিশ্বাসের ছেলে পুলিন যে দিন তার সমপাঠী ক্লাসের ভালছাত্র প্রবোধ বসুকে ১০০ শত নম্বরের নীচে রাখিয়া প্রথম স্থান অধিকার করিল, সে দিন প্রবোধ যে শুধু নিজেকে একলা অপমানিত মনে করিয়াছিল তা নয়, স্কুলের প্রায় সমস্ত ছাত্র এমন কি দীঘলিয়া গ্রামের অনেক ভদ্রলোকই তাহাতে নিজেদের অসম্মান বোধ করিয়াছিল। এই অশিক্ষিত নমঃ শূদ্রের ছেলেটা ভদ্রলোকের ছেলেদিগকে পেছনে ফেলিয়া উপরে উঠিযে, তার মত অসম্মানে তাহাদের আর কি হইতে পারে! হারাণ বিশ্বাস নিজে সরস্বতীর সুনজরে পড়িবার সুযোগ না পাইলেও মা কমলার শুভদৃষ্টি তার উপর একটু বেশী পরিমাণে বর্ষিত হইয়াছিল। শিবপুরের নমঃ শূদ্রেরা সকলেই কৃষিজীবী। খাওয়া পরার ভাবনা তাঁহাদের বড় ছিল না। বিশেষতঃ এই কয়বৎসরের মধ্যেই ইহাদের অনেকেই বেশ অবস্থাপন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। হারাণ বিশ্বাসের অবস্থা ছিল সব চেয়ে ভাল। বিশ্বাস মহাশয় বাল্যকালে একবার মা সরস্বতীর ঘরে যাইয়া, ফিরিয়া আসিয়াছেন তাই তার দৃঢ় সংকল্প পুলিনকে মানুষ করিবেন।

বিশ্বাস মহাশয় যেদিন পুলিনকে প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া যান সেদিন প্রবোধের পিতা যোগেন্দ্র বসু তার বৈঠকখানায় বসিয়া ডাকিলেন, "কি হে হারাণ তোমার ছেলেকে স্কুলে দিয়ে গেলে না কি? এ সব দিকে ঝোঁক তোমাদের কবে থেকে হ'ল হে?"

হারাণচন্দ্র উত্তর করিলেন, "ঝোঁকটা অনেকদিন থেকেই ছিল বোস মশাই! ভাগ্য দোষে নিজে কিছু শিখ্‌তে পারিনি দেখ ছেলেটার যদি কিছু হয়।"

বসু মহাশয় তামাকটা পুরা দমে টানিয়া বলিলেন, "তা তোমাদের ত এ কাজ নয় হারাণ! তাই বলছিলুম কি, হয় ত কিছু শিখ্‌তে পার্‌বে না মাঝ খান থেকে চার বাস নষ্ট হবে।"

হারাণচন্দ্র জানিতেন এরূপ কুসংস্কারসম্পন্ন ভদ্র আখ্যাধারী প্রতিবেশীর নিকট হইতে তিনি নিরুৎসাহ ছাড়া বড় বেশী কিছু আশা করিতে পারেন না। হারাণচন্দ্রের অর্থবল ছিল তাই বুকের জোরটাও নেহাৎ কম ছিল না—অমনি মুখের উপর বলিয়া উঠিলেন, "তা বোস্ মশায়ের ত এতে মাথা ব্যাথা হওয়ার কারণ দেখ্‌ছি না। লেখাপড়া শিখাটা কারো নিজস্ব জাতিগত পেশা নয়। আর আমরা এমন নূতন কাজও কিছু কর্‌ছি না। আর আর জায়গায় আমাদের জাত বেশ শিক্ষিত হয়ে উঠছে—এই শিবপুরেই কেবল মা সরস্বতীর পদার্পণ হয়নি। তা রাগ করবেন না বোস মশাই যে কতকটা আপনাদের দোষে! বাবা যখন আমাকে স্কুলে দিতে এসেছিলেন তখন এই গ্রামের অনেক ভদ্রলোক আপনার মত ঠিক এমনি—পরামর্শ দিতে এসেছিলেন। তা সেদিন আর নেই বোস্ মশায়।"

মুখের মত জবাব পাইয়া যোগেন্দ্র বাবু আম্‌তা আম্‌তা করিতে লাগিলেন। মনে মনে বলিলেন, "বেটার দুটো পয়সা হয়েছে কি না আর মাটিতে পা দিতে চায় না।"

আজ পুলিন ক্লাসের প্রথম হইয়া বসুমহাশয়কে দেখাইয়া দিলেন যে মা সরস্বতী কোন জাতি বিশেষের একচেটিয়া নন।

ক্লাসের প্রমোশনের দুইদিন পরে যোগেন্দ্রবাবু হেডমাষ্টার গিরীশ চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "মাষ্টারবাবু, আপনারা স্কুলে সব মুচি মুদ্দফরাস ভর্ত্তি ক'রে তাদিকে প্রথম ক'রে দিবেন এতে ভদ্রলোকদের মান থাকে কোথায়।"

হেডমাষ্টার বাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "স্কুলটা শুধু ব্রাহ্মণ কায়স্থের জন্য নয় বোস্ মশায়। এই যে আপনাদের একটা মজ্জাগত জাতিহিংসা এইটাই দেশের যত সর্ব্বনাশ কর্‌ছে। এই গোঁড়ামিটার দোষেই আপনারা দেশটাকে উৎসন্ন ক'রে ফেল্‌লেন। বড় হ'তে হ'লে কাউকে বাদ রেখে বড় আপনি কি বল্‌তে চান পক্ষপাতিত্ব করে আমরা ফাষ্ট্ সেকেণ্ড করি!"

বসু মহাশয়ের গাত্রজ্বালা হেডমাষ্টার বাবুর কথায় আরও বাড়িয়া গেল। একেই ত শিবপুরে তার কয়েক ঘর নমঃশূদ্র প্রজা তাহাকে বিশেষ ভয়ের চক্ষে দেখে না, তার উপর লেখাপড়া শিখিলে ত জমিদার বলিয়া খাতিরই করিবে না। বসু মহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া ওদের শিক্ষার পথটা বন্ধ করিতে পারা যায়। কাজে তিনি বড় কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না,

অধিকন্তু শিবপুরে তাহাদেরই উদ্যোগে একটা উচ্চপ্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

যোগেন্দ্রবসু গ্রামের মধ্যে একজন বিত্তশালী ব্যক্তি। বড়লোক হইলেই তার কতকগুলি পার্শ্বচর থাকেই। এই একদল অকর্ম্মণ্য লোক পিতা পিতামহের উপার্জ্জিত অর্থ বসিয়া বসিয়া ধ্বংস করে, আর পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়! সন্ধ্যায় যোগেন্দ্রবাবুর বৈঠকখানায় তাহাদের এক আড্ডা পড়িয়া যাইত।—দুই একছিলিম গঞ্জিকার আরাধনাও যে না হইত এমন নয়।

বসু মহাশয় তার পার্শ্বস্থিত রাম ভট্টাচার্য্যের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "দেখুন ভট্টাচার্য্যমশায় দেশের ছোট লোকেরা বড় মেতে উঠেছে। এদের না থামালে আর ভদ্রলোকের মান থাকবে না।"

ভট্টাচার্য্য সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়া উঠিলেন, "সে বটেই ত বোস মশায়! আমাদের যতীনও তাই বল্‌ছিল। সে বল্লে সে আর পড়্‌বে না। ভদ্রলোকের সম্মান তাহ'লে থাক্‌বে না। ছোটলোকদের সঙ্গে সাম্‌নে বস্‌তে হয় তারপর মাষ্টার নাকি তাকে দিয়ে কাণ মলিয়ে উপরে তোলে।"

ভট্টাচার্য্য তার গুণধর পুত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বসিলেন। তাঁর পুত্রটী আবার এমনি গুণধর যে তিন বৎসর পঞ্চম শ্রেণীতে ফেল হওয়ার পর হেডমাষ্টার মহাশয়ের হাতে পায়ে ধরিয়া প্রমোশন লইয়াছিল। এবার বাৎসরিক পরীক্ষায় নম্বর পাইয়াছে অঙ্কে ০, ইংরেজীতে ১৩, ইতিহাসে ৫, আর বাঙ্গলায় ২৩।"

বসু মহাশয় বলিলেন, "দেখ ত চক্রবর্ত্তী কত বড় অন্যায়। হেডমাষ্টারকে বলতে গেলুম, বেটা আমায় দুকথা শুনিয়ে দিলে। বেটা কেবল দেশ দেশ করে মর্‌ছে। ১০০ টাকা মাইনের চাকর আস্পর্দ্ধাটা দেখত। ভদ্রলোকের মান থাকল না সেটা আবার দেশ!"

চক্রবর্ত্তী বাম হাতে হুকা নামাইয়া বলিলেন, "ও বেটার কথা ছেড়ে দাও যোগেন। বেটা বামুনের ছেলেই নয়। বেটার জাত ভেদ জ্ঞান নাই-খৃষ্টান—খৃষ্টান। সেদিন মুসলমান পাড়ায় গিয়ে কেমন তাদের সঙ্গে এক বিছানায় ব'সে কেবল বকে যাচ্ছিল—দেশ—দেশ—দেশ! তা সেক্রেটারী রায় মশায়কে বল না কেন, তিনি ত সদ্ ব্রাহ্মণ।"

বসু মহাশয় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "সে ও বলে দেখেছি ভায়া। ছেড়ে দাও ওদের কথা! দেশে কি আর ব্রাহ্মণ আছে। যা তুমি আর এই

ভট্টাচার্য্য মহাশয়। দিন দিন সব খৃষ্টানীভাব ধর্‌ছে। বলে—জাত মেন না ছোটদের বড় কর। তাই নাকি খাঁটি ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। ঘোর কলি—ঘোর কলি—সব সৃষ্টি ছাড়া কথা।"

২

জীবনে যত লোকের কাছে পুলিন উৎসাহ পাইয়াছে, তার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহদাত্রী ছিল অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা স্কুলের প্রধান পণ্ডিত হরকুমার কবিরত্নের কন্যা। অল্প বয়সেই পণ্ডিত মহাশয় অন্নপূর্ণার বিবাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগ্যদোষে সে বালবিধবা। পণ্ডিত মহাশয় অন্নপূর্ণাকে যথেষ্ট সৎশিক্ষায় সুশিক্ষিতা করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবসর মত তিনি কন্যাকে দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দিতেন—যাহাতে তাঁর অভাগী কন্যা সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া ধর্ম্মপথে মতি রাখে। দর্শন শাস্ত্রে গীতার কর্ম্মবাদটা অন্নপূর্ণার কাছে বড় ভাল লাগিত। কিন্তু সে বিধবা যুবতী কুলবালা, সংসারে তার কি কাজ থাকিতে পারে! সে তার কর্ম্মহীন জীবনটা লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদিগকে পড়াইবার ভার অন্নপূর্ণা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিল। প্রতিবাসীর রোগে শোকে অন্নপূর্ণা ছিল সকলের মাতৃস্থানীয়া। হরির ছেলের অসুখ, অন্নপূর্ণা রোগীর শয্যাপার্শ্বে তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। হারাণীর মেয়ের জ্বর, দুধ সাগু খাইবে, ঘরে দুধ নাই—দুধের বাটী লইয়া অন্নপূর্ণা হারাণীর দ্বারে উপস্থিত।

এত করিয়াও অন্নপূর্ণার সময় কাটিত না। দীর্ঘদিন যেন ফুরাইতে চাহিত না। অন্নপূর্ণা ভাল উলের কাজ জানিত। ছেলে মেয়েদের টুপী মোজা প্রভৃতি তৈয়ার করিয়া সে যে পয়সা পাইত তাহাতে দরিদ্র কবিরত্ন মহাশয়ের কম সাহায্য হইত না। ব্রাহ্মণের মেয়ে হাতে পৈতা কাটার অভ্যাস তাহার ছোটবেলা হইতেই ছিল। কিন্তু পৈতা বিক্রয় শাস্ত্রানুসারে পাপ—কাজেই অন্নপূর্ণা প্রয়োজনের অধিক পৈতা কাটিত না।

ঘরের মাচার উপর বহুকালের পরিত্যক্ত একটা অর্দ্ধ ভগ্ন চরকা দেখিতে পাইয়া অন্নপূর্ণা পিতাকে বলিল, "এটা কি বাবা?"

কবিরত্ন মহাশয় চরকাটা বাহির করিয়া বলিলেন, "এটা চরকা, এতে আগে সুতো কাটা হ'ত তাই দিয়ে যে কাপড় হ'ত তাই ছিল সকলের পরিধেয়। এই যে বিলেতী কাপড় এটা খুব বেশী দিনের আমদানী নয়। আমিই খুব ছোট বেলায় হাতে কাটা সুতোর কাপড় পরেছি।"

অন্নপূর্ণা চরকা লইয়া বলিল, "আপনি আমায় তুলো কিনে দিবেন আমি সুতো কাটব।"

পিতা কন্যার কথায় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সুতো দিয়ে কি হবে মা, কে কিন্‌বে? বিলেতী ভাল সুতো খুব কম দামে পাওয়া যায়।"

অন্নপূর্ণা বলিল, "কেন বাবা, প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিব। ভাল হলে ত পুরস্কার দেবে।"

পণ্ডিত মহাশয় কন্যার ক্ষমতার সন্দিহান ছিলেন না তাই তার ইচ্ছামত তুলা কিনিয়া দিলেন।

অন্নপূর্ণা মাঝে মাঝে তাঁতী পাড়ায় বেড়াইতে যাইয়া তাহাদের কাজগুলি বেশ পর্য্যবেক্ষণের সঙ্গে দেখিত। কৃষ্ণ বসাকের কন্যা তারি মত বালবিধবা। সংসারে তাদের কেউ ছিল না—এক বিধবা জননী আর সে নিজে মায়ে ঝিয়ে তাঁত চালাইয়া তাদের বেশ চলিতেছিল। অন্নপূর্ণা একদিন ললিতাকে বলিল, "তোদের এতে চ'লে ত ললিতা?"

ললিতা উত্তর করিল, "চলবে না কেন দিদি ঠাকরুণ! বিলেতী কাপড়ের জ্বালায় তেমন লাভ হয় না। তা খরচ বাদে আমাদের ১০।১২ টাকা থাকে বইকি।"

বাড়ী আসিয়া অন্নপূর্ণা পিতাকে বলিল, 'আমাকে একটা তাঁত পেতে দিন না!"

কবিরত্ন মহাশয় যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, "একেবারেই খেপে গেলে নাকি মা!"

এ হেন অন্নপূর্ণা ছিল পুলিনের উৎসাহ দাত্রী আর উপদেষ্টা শিক্ষয়ত্রী। বিধবা হইলেও তার মোটেই "ছুৎমার্গ" রোগ ছিল না। তাই পুলিন যেদিন একটা দুর্ব্বোধ্য সংস্কৃত শ্লোক লইয়া পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী গিয়াছিল, অন্নপূর্ণা এই ছেলেটাকে কেন যেন স্নেহের চক্ষে দেখিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অতবড় একটা ছাত্রের সঙ্গে স্বাধীন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিলে তার মত যুবতী বিধবার পাছে কোন দোষের কাজ হয়, অন্নপূর্ণা তাই তার ছোট বোন সুরবালাকে দিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে পুলিনের পরিচয় লইয়াছিল। পণ্ডিত মহাশয় ছিলেন উদার প্রকৃতির লোক বিশেষতঃ পুলিনের স্বভাব চরিত্রে তিনি একান্ত মুগ্ধ ছিলেন। অনেক চেষ্টাতেও তিনি পুলিনে সংস্কৃত কাগজে ৫টী নম্বরের বেশী কাটিতে পারিতেন না

এইরূপে যাতায়াত আলাপ পরিচয়ে পুলিন পণ্ডিত পরিবারের স্নেহ লাভ করিয়াছিল। হারাণ বিশ্বাসের টাকা পয়সার অভাব ছিল না—পুলিনেরও একটা প্রকাণ্ড প্রাণ ছিল,—তাই দীঘলিয়ার অনেক দরিদ্র ভদ্রপরিবার অভাবের সময় পুলিনের অর্থ সাহায্য পাইত। সেবার জ্যৈষ্ঠ মাসে ধান চাউলের দর বড় বাড়িয়া গিয়াছিল, পুলিন নিজের গোলা হইতে ২৫/০ মন ধান দরিদ্র অনাথ ভদ্রপরিবারের মধ্যে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বিলাইয়া দিয়াছিল।

পুলিনের হাতে ঔষধের শিশি দেখিয়া অন্নপূর্ণা বলিল, "এত দৌড়ে শিশি হাতে কোথায় যাচ্ছ পুলিন?"

পুলিন অন্নপূর্ণাকে দূর হইতে প্রনাম করিয়া বলিল, "রমেশ বাবুর ছেলের বড় অসুখ তাদের ডাক্তার বাড়ী যাবার লোক নেই এই ঔষধটা দিয়ে আসি।"

অন্নপূর্ণা শুনিয়া আনন্দিত হইয়া বলিল; "তুমি পারবে পুলিন, ছোট থেকে বড়, মানুষ থেকে দেবতা কি করে হওয়া যায় তা তুমি জান।"

পুলিন হাসিয়া বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ দিদি, আমায় শিখিয়ে দিবেন কি করে মানুষ হওয়া যায়।"

অনেক দিন হইতেই অন্নপূর্ণা এই ছেলেটীর প্রত্যেকটা কাজ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। অন্নপূর্ণা কি একটা প্রবন্ধে পড়িয়া ছিল,—যে জাতি যখন জাগে তাদের মধ্যে তখন অনেক আত্মত্যাগী পুরুষ জন্মগ্রহণ করে। অন্নপূর্ণা পুলিনের ভিতর সেই ত্যাগীর ছায়া দেখিতে পাইয়া মনে মনে বলিত, বাঙ্গালী আবার উঠিবে সাধারণের ভিতর হইতে যদি এমন সন্তান বাহির হয়—তবে বাঙ্গলার দূর ভবিষ্যৎ নেহাৎ অন্ধকারময় হইতেই পারে না।"

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া পুলিন কলিকাতা আসিয়া কলেজে ভর্ত্তি হইলে মেসে থাকা লইয়া প্রথমে তাহাকে বড় বেগ পাইতে হইয়াছিল। হারাণ বিশ্বাস বিরক্ত হইয়া পুলিনের জন্য ছোট একখানি বাসা ভাড়া করিয়া দিলেন সমস্ত অসুবিধা শেষ হইয়া গেল।

৩

পণ্ডিত মহাশয়ের দ্বিতীয় কন্যা সুরবালা চোদ্দ পার হইয়া পনেরতে পা দিয়াছে, আর তার বিবাহে বিলম্ব করিলে চলে না। পণ্ডিত মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়া মাত্র ৩০০ শতটী টাকার যোগাড় করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ৩০০ টাকায় সুরবালার বিবাহ হয় না। যেখানেই বিবাহের সম্বন্ধ করেন

বরকর্ত্তা ৫০০ শত টাকার কমে কিছুতেই স্বীকার করেন না। কাজেই বিবাহও হয় না।

একদা পণ্ডিতগৃহিণী নথ নাড়া দিয়া বলিলেন, "মেয়েটার ত বিয়ে দিতে হবে। বাড়ী ঘর যা আছে বন্ধক দিয়ে দু'শো টাকা ধার করে ফেল।"

পণ্ডিত মহাশয় ম্লান মুখে বলিলেন, "বাঁধা না হয় দিলুম কিন্তু টাকা শোধ কর্‌ব কি ক'রে! এই ৩০টী টাকা মাহিনে এতেত খোরাক্ জুটানই ভার!"

গৃহিণী একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তা কি কর্‌বে বল! মেয়েকে ত আইবুড়ো ক'রে রাখ্‌তে পার্‌বে না। বাঙ্গালীর ঘরে মেয়ে জন্ম দেওয়া কত জন্মের মহাপাপের ফল! পুলিন আমাদের বাড়ী আস্‌ত-জান ও পাড়ায় কি কলঙ্কের কথা-রটেছে। বলে পুলিন ত ওদের সাহায্য কর্‌বেই-ঘরে দুই দুইটী সোমত্ত মেয়ে!"

"নারায়ণ, নারায়ণ" পণ্ডিত মহাশয় কাণে আঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া বলিলেন, "তা যোগেন বোস্‌দের বাড়ী ও সব কথা হয় বুঝি?

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "শুধু বোস্‌দের বাড়ী হবে কেন ভট্টাচার্য্য বাড়ীতেও হয়।"

কবিরত্ন মহাশয় অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা বলুকগে তারা। রাম ভট্টাচার্য্যের বাড়ীত! তার ঐ গুণধর পুত্রের জন্য আমাদের সুরকে চেয়েছিল। না হয় তার ক'টি টাকা আছে তা বলেত মেয়েটাকে একটা গাধার হাতে তুলে দিতে পার্‌ব না। বাপে গাঁজা খায়—ছেলে আবার গাঁজা মদ দুটোই ধরেছে। আমার দেওয়া আমি দেখেই দিব—ভিটে ছাড়া হ'তে হয় তাও স্বীকার।"

এমন সময় পুলিন বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে প্রণাম করিল।

পণ্ডিত মহাশয় আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "পুলিন যে, কল্‌কেতা থেকে কবে এলে?"

পুলিন উত্তর করিল, "কাল এসেছি—বড় দিনের ছুটী। দিদি কোথায়!"

অন্নপূর্ণা ঘরে বসিয়া মোজা প্রস্তুত করিতেছিল। বাহিরে আসিয়া বলিল, "দাওয়ায় উঠে ব'স—এতদিন শরীর ভাল ছিল ত!"

পরদিন পণ্ডিত মহাশয় গৃহিণীকে বলিলেন—"যাই তবে বাড়ীটা বাঁধা

দিয়েই দু'শ টাকা এনে দেখি। মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি পার না কর্‌লে দেখছি লোকে আমার দুর্নাম রটাবে। এর চেয়ে বেশী বয়সের মেয়েও কিন্তু ভদ্রলোকের ঘরে আছে তা সুর একটু বেড়ে উঠেছে বইত নয়! তবে এটা ঠিক যে এর পর ভিটে ছাড়া হতেই হবে।"

পুলিন ২০০৲ শত টাকার দুই খানি নোট পণ্ডিত মহাশয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "ভিটে ছাড়া হ'তে হবে কেন পণ্ডিত মশাই। আপনার মত দেবতার যদি কন্যাদায়ে ভিটে ছাড়া হ'তে হয় তবে তার চেয়ে বাঙ্গালী জাতির দুর্দ্দশা আর কি হ'তে পারে! একটা ব্রাহ্মণ কন্যার জাত রক্ষার জন্য ভগবান এই ছোট লোকটার হাতে দু'চারটী টাকার অভাব ক'রে দেননি।"

পুলিন পণ্ডিত মহাশয়কে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই বাহিরে আসিতেছিল, পাছে তিনি টাকা গ্রহণে অস্বীকার করেন! কিন্তু বড় ঘরের দাওয়া হইতে অন্নপূর্ণা যখন ডাকিল, "পুলিন।" পুলিনকে তখন বাধ্য হইয়াই ফিরিতে হইল।

অন্নপূর্ণা বলিল, "অত উচুতে দাঁড়িয়ে কাজ কর্‌লে ভাল হয় না তা তোমায় অনেকদিন বলেছি।"

অন্নপূর্ণার কথার মর্ম্ম গ্রহণ না করিতে পারিয়া পুলিন বলিল, "বুঝতে পার্‌লুম না দিদি কি মনে ক'রে আপনি বলছেন। এই টাকা ক'টির কথায় কি?"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "শুধু টাকার কথায় কেন, সংসারে যারা উঁচুতে দাঁড়িয়ে কাজ কর্‌তে থাকে, এত উঁচু যে মানুষ তাদের লাগালই পায় না, তাদের কাজ বুঝতে না পেরে সাধারণে তাদের কার্য্যে দোষ দেখতে থাকে। তাই মানুষের মধ্যে কাজ কর্‌তে হলে একটু নীচুতে নেমে আস্‌তে হয়।"

পুলিন বিস্মিত হইয়া বলিল, 'তবে কি অসময়ে মানুষ মানুষকে সাহায্য কর্‌বে না?"

অন্নপূর্ণা সহাস্যে বলিল, "আমি কি বলছিরে পাগল; সাহায্য ত কর্‌বেই সেইটাই ত মানুষের কাজ। তবে অযাচিত আত্মীয়তা—অযাচিত করুণায় মানুষ বিশ্বাস কর্‌তে চায় না যে করুণাময়ের তাতে কোন দুরভিসন্ধি বা স্বার্থ নেই।"

পুলিন বুঝিয়াই উঠিতে পারিল না কেন আজ অন্নপূর্ণা তাহাকে এত কথা

বলিতেছে। এটা কি তার সত্যিকার কথা না তাহাকে পরীক্ষা করা। যে অন্নপূর্ণা একদিন তাহাকে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা দিয়াছিল, যে একদিন জীবের মঙ্গলে তাহাকে আত্মদান করিতে উপদেশ দিয়াছিল। যার উপদেশে সে বুঝিয়াছিল কি করিয়া মানুষের সঙ্গে মিশিতে হয়, কি করিয়া পরকে—অতি বড় শত্রুকেও আপন করিয়া তোলা যায়। সেই অন্নপূর্ণা আজ তাহাকে কি সব বলিতেছে। পুলিন কোন প্রতিবাদ না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অন্নপূর্ণা বলিতে লাগিল, "সংসারে বড় বড় কাজ কর্‌তে গেলে বড় কষ্ট সহ্য কর্‌তে হয়। পুলিন,—তুমি লোকের ভাল কর্‌ছ মানুষে মনে কর্‌বে তুমি মন্দ কর্‌ছ।'

এবার পুলিন বলিয়া উঠিল, "মানুষের কথায় ত ভাল মন্দ বিচার করা চলেনা দিদি—কাজের ভাল মন্দ তার ফলে।"

অন্নপূর্ণা বলিল, 'তাইত বল্‌ছি পুলিন—ফলটা মানুষ আগেই দেখে না। মানুষ প্রথমটাকে শেষ ধ'রে নিয়ে বিচার কর্‌তে আরম্ভ করে। সেই বিচার আবার এমনি গুরুতর যে সে নিন্দা অপযশ—শত্রুতা কত কি ছাড়িয়ে উঠা বড় শক্ত। পার্‌বে ত?"

পুলিন দৃঢ় স্বরে বলিল, "আপনাদের আশীর্ব্বাদ থাকিলে কেন পারব না দিদি কিন্তু ভাল কাজ করলেও মানুষ মানুষের শত্রু হ'বে কেন বুঝলুম না।"

অন্নপূর্ণা উত্তর করিল, "সংসারের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে ঠিক হ'লে সব বুঝবে। নিজে ভাল ত জগৎ ভাল কথাটা সব জায়গায় খাটে না। এমন লোকও জগতে বিরল নয় যে হাজার ভাল করলেও তাদের কাছে ভাল হওয়া যায় না।"

পুলিন বলিল "তত খারাপ লোকের সংখ্যা কিন্তু খুব কম। জানেন না দিদি, যে প্রবোধ বসু একদিন আমাকে তার শত্রু বলিয়া মনে কর্‌ত, সে এখন আমার পরম মিত্র। সেবার মেসে তার খুব কলেরা হয়েছিল, সকলে তাকে মেস্ থেকে হাঁসপাতালে যেতে ভয় পেলে। আমি তাকে নিজের বাসায় এনে চিকিৎসা করিয়েছিলুম তার পর থেকে গত ব্যবহারের জন্য আমার কাছে ক্ষমা চাইলে। কিন্তু আজও তার পিতার সুনজরে আমি পড়তে পারলুম না। আমাদের জাতটার উপর তাঁর একটু জাতক্রোধ—নইলে—বাধ হয়—।"

অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিল, "তা জানি পুলিন, ঐ জাত রোগেই ত সব গেল।

কিন্তু তোরা মানুষ হ, জাত তোদের বড় হ'বে। আশীর্ব্বাদ করি ঘরে ঘরে পুলিন তৈরী হোক জাত্যাভিমানী পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে।"

৪

ফরিদপুরের তার কতকগুলি স্বজাতি হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে সংবাদ পাইয়া পুলিন কলিকাতা হইতে রওনা হইল। ঐ দলের নেতা পঞ্চানন রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, "পঞ্চানন বাবু আপনাদের এসব কি? সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করে বিধর্ম্ম হ'চ্ছেন কেন?"

পঞ্চানন রায় উত্তর করিলেন, "হিন্দুধর্ম্মকে আপনি সনাতন বলতে চান? যে ধর্ম্মে তার জাত ভাইকে এত ঘৃণার চোখে দেখে, যে ধর্ম্মে সমক্ষমতাপন্ন মানুষকে এত ছোট করে রাখে সেটাও কি আবার একটা ধর্ম্ম।"

পুলিন মৃদু হাস্যে বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্র বোধ হয় রায় মহাশয়ের বেশী দেখা হয় নাই। হিন্দুধর্ম্মে সমক্ষমতাপন্ন ভাই ভাইকে ছোট বলে মনে করেনা। তবে যেটা বাস্তবিক সত্যিকার ধর্ম্ম তা দেশে এত দিন বড় ছিল না আবার জেগে উঠছে। যাকে আপনি ধর্ম্ম বলে মনে করছেন সে একটা কুসংস্কার আর অশিক্ষার ফল হিংসা। সুখের বিষয় হিংসাটা দিন দিন কমে যাচ্ছে নিজ নিজের দোষে ছোট করে রেখে বড়র সমান হ'তে যাওয়া কি খুব যুক্তি সঙ্গত?"

পঞ্চানন রায় একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কি সব বলছেন নিজের দোষে আমরা ছোট করে রেখেছি, তাই বুঝি আমাদের জলটুকু পর্য্যন্ত খায় না?"

"সব দোষটাই যে আমাদের তা আমি বলছিনে তবে বেশীর ভাগ দোষটা যে আমাদেরই, বিচার করে দেখলে অস্বীকার করতে পারবেন না। নিজকে ছোট মনে করার মত বড় দোষত আমার চোখে আর কিছু পড়ে না। নিজকে আমরা ছোট ভাবি তাই সবাই আমাদের ছোট মনে করে। তবে জল খাওয়াটার কথা বলছেন তাতেই আমি বলতে চাই, উপযুক্ত হ'লে বা আবার ব্যবহার ভাল দেখলে বামুনেও আমাদের হাতে জল খেতে আপত্তি করবে না। দেখুন পঞ্চানন বাবু, দেশে যে বাতাস বইতে সুরু করেছে এতে ওসব গোড়ামি আর বেশী দিন থাকবে না। সহরেত এক রকম অন্ততঃ জল খাওয়ার বিচারটা উঠেই যাচ্ছে। তারপর দেশের যাঁরা নেতা তারা সমস্ত জাত এক ক'রে একটা অখণ্ড হিন্দু জাতিতে পরিণত করবার চেষ্টায় আছেন। তাই বলে কি

পিতা পিতামহের ধর্ম্মটা ছেড়ে দিবেন। আমাদের মত নিপীড়িত আরও কত জাত আছে। কেউত জল খাওয়াইতে পারে না ব'লে ধর্ম্ম ছেড়ে দিচ্ছে না, ধরুণ না এই যোগী জাতিটার কথা তারা কত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা নিয়ে রীতিমত প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত নিচ্ছে নিজদিগকে ব্রাহ্মণ বলতে চেষ্টা কর্‌ছে। ব্যবস্থা ত ব্রাহ্মণেরাই দিয়েছে তাই ব'লে ব্রাহ্মণ সমাজ কি তাদের ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করতে চায় না তাদের আচরণীয় বলে গ্রহণ করে! তাদের কত বড় দাবী, তাঁরা বলেন একদিন তাঁরা ভারতের রাজন্যবর্গের গুরু স্থানীয় ছিলেন। পণ্ডিত শাস্ত্রী মহাশয়ও স্বীকার করে তাহাদের বাঙ্গলার নবম গৌরব আখ্যা দিয়েছেন; তাতে তাঁদের কি ফল্ হ'চ্ছে! যতক্ষণ না তাঁরা নিজের কার্য্যে তাদের পূর্ব্ব গৌরব দেখাতে পারেন ততক্ষণ লোকে মান্‌তে চাইবে না। কতগুলি শাস্ত্র পুথির প্রমাণের উপর নির্ভর করে বড় হওয়া চলে না পঞ্চানন বাবু, এই সুবর্ণ বণিকদের কথাই ধরুন, বাঙ্গালায় তারা ধনে বিদ্যায় চেহারায় কোন্ জাতির চেয়ে হীন? জল তাদেরও কেউ খায় না। খায়না আবার খায়ও। স্থান বিশেষে ব্রাহ্মণের মত তাদের সম্মান। সে শুধু তারা ভিতর থেকে বড় হ'য়ে উঠেছে বলে। আর কত নাম করব।"

"আপনি যাই বলুন না কেন পুলিন বাবু, ভদ্রলোকে আমাদিগকে বড় ঘৃণা করে।"

"ঐ ত মশায় দোষ! ভদ্রলোকে ঘৃণা করে। আপনি কি ভদ্রলোক নন্' ভদ্রলোকে ঘৃণা করে না, ঘৃণা করে ভদ্র আখ্যাধারী ছোট লোকে। কিন্তু এও ঠিক জান্‌বেন যে যতই তারা ঘৃণা করুক আমরা ভিতর থেকে ভাল হয়ে উঠ্‌লে তাদের সেই ঘৃণা একদিন শ্রদ্ধারূপে পরিণত হ'বে। নিজের ভিতরকার উচ্চতা দেখিয়ে প্রমাণ করুন আমরা বড়। সমাজে শিক্ষার বিস্তার করুন আচার ব্যবহার ভাল করুন, হিন্দুধর্ম্মে নিষ্ঠাবান থাকুন, সবাই মাথায় তুলে নেবে। তা না করে লাফ দিয়ে ত' গাছে উঠা যায় না। আমরা আছি গাছের গোড়ায়, তারা আছে উপরে, আমাদেরও খানিক উঠতে হ'বে তাঁদেরও খানিক নামতে হ'বে, তবে আমরা তাঁদের লাগাল পাব।"

"তাঁরা সেটুকু নাব্‌বে না কত বড় হিংসা যে নাপিতটা পর্য্যন্ত আমাদের নেই।"

পুলিন ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল। নিজের মনের একটা তীব্র দুঃখ চাপিয়া বলিল—"নেই হ'বে। হিংসা যা বল্‌ছেন

ধরতে গেলে বাঙ্গালী জাতির মধ্যে খুব কম। আমি ডাক্তার রায়ের একটা প্রবন্ধে পড়েছি, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে এত হিংসা যে ছোট জাতির ছাতা মাথায় দিয়ে রাস্তায় চলবার অধিকার নেই, উঁচু জাতিরা তাদের সাম্‌নে আসা ত দূরের কথা, তাদের ছায়া পর্য্যন্ত মাড়ায় না। তারাই অস্পৃশ্য। বাঙ্গালায় তেমন অস্পৃশ্য বলে কিছু নেই। আমাদের উঠবার যথেষ্ট সুযোগ তাঁরা ক'রে দিয়েছেন। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই হ'ল। সে চেষ্টা না করে ধর্ম্ম ত্যাগ করলে কি ফল হ'বে।"

"আপনি ছেলে মানুষ জাতিহিংসার কামড় যে কত শক্ত তা এখনও বুঝে উঠতে পারেন নি রাস্তায় কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে গাড়াতে আপনার আলাপ হ'ল, বেশ আলাপ, যেই আপনার নামটী তিনি শুনলেন, অমুক নমঃশূদ্র অমনি তিনি নাসিকা কুঞ্চিত করে মুখ ফিরিয়ে বস্‌লেন। তার চেয়ে খ্রীষ্টান হয়ে নামের আগে এলবার্ট কি কিছু লাগিয়ে উপাধিটা ঝালিয়ে ফেল্‌লে কেউ জাতের খবর জিজ্ঞাসাও কর্‌বে না। আর নাক্ সিটকাইবারও দরকার ত হবে না।

পুলিন হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল, "পঞ্চানন বাবু তা কি কখন হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদে পড়েছি—

"নিশি যবে যায় কোন দেশে—
মলিন বদনা সবে তার সমাগমে"

ঐ যে যোগিদের কথা বলেছি না, তাঁদের উপাধি হ'ল নাথ। তার অর্থ প্রভু স্বামী। আর কায়স্থ জাতির সাধারণ উপাধি "দাস" মানে ভৃত্য। কিন্তু প্রভু উপাধি লাভ করেও তদুপযুক্ত গুণ হারিয়ে তারা হীন—আর দাস হয়েও সদ্‌গুণ সম্পন্ন বলে কায়স্থরা শ্রেষ্ঠ। চাই নিজেদের ভিতরকার উন্নতি।"

পঞ্চানন বাবু একটু নরম হইয়া বলিলেন, "তা যাই বলুন পুলিন বাবু, এ ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিধর্ম্মী চামার হলেও লোকে তাকে ঘৃণা করে না কিন্তু নিজের জাতভাইকে ঘৃণা করা বাঙ্গালীর মজ্জাগত দোষ! হিন্দুজাতির সঙ্গে আমাদের নন্ কোঅপারেশন হওয়াই উচিত। দেখি এতগুলি লোককে ফেলে রেখে বাঙ্গালী কি করে তার অভীষ্ট লাভ করে।"

পুলিন মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া বলিল, "তাতে ফল এই হবে যে দেশবাসীর চক্ষে চিরকাল ছোট থেকে যাবেন। দেশের ও দশের মতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর ফল কোন কালেই ভাল

হতে পারে না! এ সব ছেড়ে দিন পঞ্চানন বাবু, জাতের কথা ভুলে গিয়ে একবার দেশের কথা ভাবুন, আগে দেশ পরে জাত। যতই নিজের দেশকে আপনার বলে মনে কর্‌বেন জাতিগত স্বাতন্ত্র্য ততই চলে যাবে। একদিকে দশের সঙ্গে মিশে নিজকে তাদের একজন মনে কর্‌বেন, অন্যদিকে নিজের জাতটাকেও বড় কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বেন। এই যে দেশে বড় বড় কাজের ফর্দ্দ হচ্ছে, তাতে কয়জন নেতা অনুন্নত জাতি থেকে বেরিয়েছে বলুন ত! নামে যারা বড় কাজেও তারা বড়। বড় বড় নেতা তৈরী করে তাদের দেশের কাজে আত্মনিয়োগ কর্‌তে শিখান। মায়ের ডাক শুন্‌তে পান্‌নি? সকলেই শুনেছে। আজ সমগ্র ভারতের ঘুম মায়ের ডাকে ভেঙ্গে গেছে। মায়ের ছেলে আমরা সব বড় আর ছোট ভাই। বড় ভাই ছোট ভাইকে ঘৃণা কর্‌তে হয় করুক্ আমরা ছোট ভাই মহত্বে বড় ভাইকে ছাড়িয়ে উ'ঠে মায়ের আদরের ছেলে হব পেছিয়ে পড়ে থাক্‌ব না আগেই যাব।"

বলিতে বলিতে পুলিনের চক্ষে জল আসিল পঞ্চানন বাবু স্তব্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।

৫

রাম ভট্টাচার্য্য যত বার পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন পণ্ডিত মহাশয় ততবারই অস্বীকার করিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র মনে করিয়াছিল দরিদ্র পণ্ডিত মহাশয় তার মত সুপাত্র আর কোথায় পাইবে! বিশেষতঃ সে যখন টাকা লইবে না তখন পণ্ডিত মহাশয়ের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কন্যাটী নিশ্চয়ই তার ভাগ্যে জুটিয়া যাইবে। বিবাহের প্রস্তাবের পর হইতেই যতীন মাঝে মাঝে পণ্ডিত মহাশয়ের বাটীর চারি ধারে ঘুরিয়া বেড়াইত গান গাহিত আর শিশ দিত। কদাচিৎ সুরবালার দেখা পাইলে কুৎসিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিত।

যখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় গৃহিনীর কাছে পণ্ডিত মহাশয়ের শেষ অসম্মতির কথা বলিতেছিলেন ঠিক তখন বাহির বাড়ী হইতে যোগেন্দ্র বসু ডাকিলেন, "ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বাড়ী আছেন?"

যতীন তাহার পিতাকে ডাকিয়া দিলে বসু মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বিয়ে ঠিক হল?"

ভট্টাচার্য্য সক্রোধে বলিলেন, "আর বিয়ে! কবিরত্নকে কত বল্‌লুম, মেয়ের বিয়ে তা কত দেমাক। যতীনের একান্ত ইচ্ছে, তাই একটা পয়সাও চাইলুম

না। সেধে বে' দিতে পার্‌বে না—আমাদের ঘর কি আর ওদের ঘর কি! বেঁচে থাক্‌লে যতীনের জন্য আমি হাজারটী টাকা নেব দেখ্‌বেন।"

বসু মহাশয় উত্তর করিলেন, "তাইত ভট্টাচার্য্য মশায়, মেয়ের বে' দিবে বলে পণ্ডিত মশায় আমার কাছে দু'শ টাকা ধার কর্‌তে গে'ছিলেন। তা টাকাই বা কোথায় পেল!"

মাঝখান হইতে যতীন বলিয়া উঠিল, "ও বুঝেছি ঐ পুলিনটা টাকা দিয়েছে ঠিক্! গত বড়দিনের সময় তাকে চিঠি লিখে আনিয়েছিল। আজ-কাল ঐ একরকম জামাই কিনা। না বাবা আমি ও বিয়ে করব না।"

যথা সময়ে সুরবালার বিবাহ হইয়া গেল। পুলিন তখন কলিকাতায়। তার হাতে তখন অনেক কাজ সে বিবাহে যোগ দিতে পারিল না। অন্নপূর্ণা পুলিনকে আসিতে লিখিল, পুলিন উত্তর দিল সে যাইতে পারিবে না। এমন কি গরমের ছুটীতেও সে বাড়ী যাইবে না মায়ের ডাকে ছেলেরা বাহির হইয়া পড়িয়াছে সেও মায়ের ছেলে। পারে ত পূজার ছুটীতে তাঁহাদের চরণ দর্শন করিবে।

পূজা আসিল। বাঙ্গালী আবার বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া মাতৃমূর্ত্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিল। বাঙ্গালার রোগ দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট জনশূন্য পল্লী আবার অনন্ত কোলাহলে মুখর হইয়া উঠিল। বাঙ্গালার ঘরে ঘরে নূতন বস্ত্র নূতন অলং-কারের সাজ।

পুলিনও নূতন সাজে সাজিয়া বাড়ী আসিল সে দিন সপ্তমী পুলিন সেই দিনই বাড়ী পৌছিয়েছে। পূজার গোল্‌মালে দীঘলিয়া যাইতে পারে নাই।

সপ্তমীর চাঁদ আকাশে মৃদু মৃদু হাসিতেছে, অন্নপূর্ণা তার গন্ধবিহীন ঝরিয়া পড়া ফুলের মত দেহখানি চাঁদের আলোকে বিছাইয়া দিয়া ভাবিতেছিল তার গন্তব্য আর কতদূর।

এমন সময় সুরবালা ছুটিয়া আসিয়া বলিল, "দিদি, পুলিন দা এসেছে। আমি ওবাড়ীর শৈলদের সাথে ঘোষদের বাড়ী ঠাকুর দেখ্‌তে গিয়েছিলুম; দেখি, পুলিন দা বোসদের বাড়ীর প্রবোধের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমায় জিজ্ঞেস্ কর্‌লে কেমন আছ দিদি! আমি তার সাথে কথা কইতে পার্‌লুম না ভট্টাচায্ বাড়ীর সেই যতীনটা আমার দিকে কট্‌মট ক'রে চাইতে লাগলো। ঘোস্‌দের বাড়ী ঘু'রে ফির্‌তে দেখি সে তার কয়জন সঙ্গী নিয়ে বোতল থেকে কি ঢাল্‌ছে আর খাচ্ছে।"

অন্নপূর্ণা উঠিয়া বসিল, বলিল, "যাক্ কখনো ওদের সাম্‌নে বে'র হোস্‌নে। দেশের মুটে মজুরে মদ খাওয়া ছেড়ে দিল আর ওরা ভদ্রলোকের ছেলে হ'য়ে ছাড়্‌তে পার্‌ছে না। আমার ইচ্ছে ছিল না ও'মাতালটার সঙ্গে কথা কই তা দেখ্‌ছি না কইলে আর নয়।"

প্রবোধের হাত ধরিয়া পুলিন অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের দিকে চাহিয়া বলিল, "একি বেশ ভাই তোমাদের?"

পুলিন উত্তর করিল, "এই নূতন পূজার পোষাক দিদি। মা এসেছেন নূতন পোষাক পরব না। নূতন সবাই চায়—এ সব চেয়ে নূতন।—ঘরের দেওয়া জিনিষ দিদি! আপনি এবার সুতোকেটে দিবেন—খুব ভাল পোষাক হবে।"

অন্নপূর্ণা উভয়কে আসন দিয়া বলিল, "প্রবোধ, তোমাকে পুলিনের সঙ্গে দেখে আমি বড় খুসী হয়েছি আজ থেকে তুমিও আমার ভাই।"

প্রবোধ উত্তর করিল, "পুলিনের কাছে সব শুনেছি দিদি, বাবার জন্যে এতদিন আমি ওর সঙ্গে মেশামেশি কর্‌তে পার্‌তুম না। তা বাবা আর এখন কিছু বলেন না। অশীর্ব্বাদ করুণ যেন ভাই ভাই এক হয়ে দেশ মাতৃকার দুঃখ দূর কর্‌তে পারি।"

অন্নপূর্ণার চক্ষে জল আসিল। অন্নপূর্ণা কেবল বলিল, "আজ আমার দু'টী ভাই!"

কথায় কথায় রাত্রি অনেক হইয়া গেল—অন্নপূর্ণা জলযোগ না করিয়া উঠিতে দিল না। পূজাবাড়ীর কোলাহল তখন থামিয়া গিয়াছে, মুখরপল্লী আবার সুপ্তি ঘোরে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।

অন্নপূর্ণা বলিল, "তোমাদের আর যেয়ে কাজ নেই রাত অনেক হয়েছে এখানেই থাক।"

প্রবোধ বলিল, "না দিদি বাবা আমায় বক্‌বেন।"

প্রবোধ উঠিয়া বাহিরে আসিল, পুলিন ডাকিয়া বলিল, "আস্তে হাট প্রবোধ আমিও যাচ্ছি। না দিদি, আমিও যাই আসতে মা কত বারণ করেছিলেন, সকালে চলে আসব ব'লে এসেছি!"

অন্নপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া পুলিন চলিয়া আসিতেছিল, সুরবালা দৌড়িয়া পুলিনের হাত ধরিল, বলিল, "পুলিনদা, তুমি যেওনা ভাল হবে না বলছি, কত বড় মাঠ একা যাবে! ভুত প্রেত কতকি রাতে চলা ফেরা করে!"

পুলিন হাসিয়া বলিল, "ভূতের ভয়! ভূত বলে কিছু নেই নিদি! ছেড়ে দাও!"

সুরবালা উত্তর করিল, "ভূত না থাক্ ভূতের বাবা মানুষ ত আছে! তা যাও—"

রাগ করিয়া সুরবালা পুলিনের হাত ছাড়িয়া দিল, পুলিন বাহির হইয়া পথে নামিল। সুরবালা শিহরিয়া উঠিল, সে মাতালগুলির কি একটা দুরভিসন্ধির কথা অল্প অল্প শুনিয়াছে। ব্যস্ত হইয়া সে অন্নপূর্ণাকে বলিল, "পুলিনদাকে ফেরাও দিদি।"

সুরবালা নিজেই ডাকিল, "পুলিনদা ফে'র!" পুলিন একটু অগ্রসর হইয়াছিল, সুরবালার নারীকণ্ঠ শুনিতে পাইল না। রাস্তার ধারে একটা গাছ গাছের ছায়ায় অন্ধকার। পুলিন থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"কে রে প্রবোধ!"

যতীন ভট্টাচার্য্য বিকট মুখ ভঙ্গি করিয়া টলিতে টলিতে বলিল, "চিন্‌তে পার্‌ছনা বাবা, মজা লুঠে খাচ্ছ। শালা রাতে যাতায়াত সুরু করেছ। তুমি আমার শীকার কেড়ে নিয়েছ, শালা ছোটলোক বামুনের জাত মার্‌ছ।"

"উহু—প্রবোধ!" বলিয়া পুলিন মাটিতে পড়িয়া গেল। এই চীৎকার শব্দে অন্নপূর্ণাও সুরবালা ছুটিয়া আসিল। প্রবোধও অনেক দূর অগ্রসর হয় নাই—সেও ঘটনা কি দেখিবার জন্য দৌড়িল।

যতীন দৌড়িয়া পালাইতেছিল, কিন্তু মদের ঝোকে একএকবার পড়িয়া যাইতেছিল। প্রবোধ বজ্রমুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। ধরাধরি করিয়া পুলিনকে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে লইয়া যাওয়া হইল। কেহ ডাক্তার বাড়ী কেহ শিবপুরে সংবাদ দিতে ছুটিল—সুপ্ত পল্লীর বুকে একটা করুণ আর্ত্তনাদ নৈশ প্রকৃতির জড়তা ভাঙ্গিয়া বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হইল।

(৬)

আজ দশমী পুলিনের মাথায় প্রকাণ্ড ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। পার্শ্বে জননী অশ্রু মোচন করিতেছিলেন। পুলিন ক্ষীণ স্বরে ডাকিল, "মা, কেঁদনা, বাবা কোথায়।"

হারাণ বিশ্বাস পূজার কাজে ব্যস্ত ছিলেন একজন তাহাকে ডাকিয়া দিল। বিশ্বাস মহাশয়ের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন মাত্র নাই—নীরবে রোগীর শয্যাপার্শ্বে যাইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পুলিন বলিল, "বাবা, মা কাঁদ্‌ছে, সান্ত্বনা করুন, কেঁদনা মা, এবার আমি যাই আবার আস্‌ব। তোমার ঘরেই আস্‌ব মা আমার কাজ শেষ করে যেতে পার্‌লুম না।"

জননী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন। বিশ্বাস মহাশয় ধমক দিয়া বলিলেন, "কাঁদ্‌ছ কেন? ছেলেকে আমি মায়ের সেবায় উৎসর্গ করেছিলুম ও আর আমাদের ছেলে নয়। দেবতার জিনিষ দেবতা নিয়ে যাচ্ছেন আমাদের কি! পুলিন, দারোগাবাবু এসেছেন।"

পুলিম উত্তর করিল, "প্রবোধ আগে আসুক।"

জননী চক্ষে অঞ্চল দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। এ কয়দিন পুলিন ইচ্ছা করিয়াই জবানবন্দী দেয় নাই। একটু সুস্থ না হইলে জবানবন্দী দিবে না বলিয়া আপত্তি জানাইয়াছে।

প্রবোধ আসিল, পুলিন বলিল, "প্রবোধ, যতীনকে থানায় নিয়ে গেছে না?"

প্রবোধ উত্তর করিল, "আর কোথায়! হাতে মুঠে ধরা আসামী। বাঁচবার অনেক চেষ্টা করছে বটে তা'কি আর হয়।"

পুলিন ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিল, "প্রবোধ, ওকে বাচালে হয় না? ওকে মারলে আর কি হবে।"

প্রবোধ স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল। পুলিন বলিতে লাগিল, "চমকায়ো না প্রবোধ! ওকে বাচাতে হবে; সেই জন্য ক'দিন আমি জবানবন্দী দিইনি। ওত আমাদেরি ভাই! সংশোধন ত শাস্তির উদ্দেশ্য! ওকে যদি ভাল বেসে শোধরাতে পারি। ভাই হয়ে ভাইকে জেলে দেওয়া কি ফাঁসি কাষ্ঠে তুলে দেওয়া ত মায়ের ছেলের কাজ নয় ভাই!"

প্রবোধ কথা কহিতে পারিল না। কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। কেবল বলিল, "পুলিন তুই কি মানুষ।"

পুলিনের অধরে ক্ষীণ হাসি খেলিয়া গেল।—বলিল, "মানুষ! একটা অপদার্থ জীব, ছোটলোক, তবে মায়ের ছেলে, যে তাঁর ডাক শুনেছে। হয় ত আমাকে মারবার উদ্দেশ্য ওর ছিল না। মদের নেশায় হাতের বোতলটা কি আর কিছু আমার মাথায় মেরেছে ওকে মারলে চলবে না ভাই, মানুষ ক'রে তুলতে হবে। আমাকে রাখা মায়ের ইচ্ছা নয় নইলে একটা বোতলের ঘায়ে আমি মরতুম না। দারোগাকে বল প্রবোধ "যতীনকে একা আমার কাছে পাঠাতে হবে নইলে জবানবন্দী আমি দিব না।"

অগত্যা দারোগা তাহাতেই সম্মত হইলেন; বিশেষতঃ রাম ভট্টাচার্য্যর টাকার থলিতে দারোগা বাবুর লোহার সিন্ধুক প্রায় ভরিয়া গিয়াছিল।

কয়েদীকে পুলিনের ঘরে লইয়া যাওয়া হইল, সঙ্গে রাম ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অনেকেই গেলেন। ভট্টাচার্য্য যোড়হস্তে পুলিনের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাঁচাও বাবা আমার একমাত্র ছেলেটাকে! তোমাদের স্বদেশী ফণ্ডে আমি দু'হাজার টাকা দিব।"

পুলিন ভট্টাচার্য্যকে যোড় হস্তে নমস্কার করিয়া বলিল, "ছি ছি আপনি ব্রাহ্মণ আমি শূদ্র যোড়হাত হয়ে আমাকে অপরাধী করবেন না। আশীর্ব্বাদ করুন যেন ফিরে এসে বাকী কাজগুলো ক'রে যেতে পারি। টাকার লোভ দেখাবেন না। যতীন বাবু প্রতিজ্ঞা করুন, আর মদ স্পর্শ করবেন না জাতিহিংসা ভুলে যাবেন, আর মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবেন।"

গৃহ নিস্তব্ধ, সকলে স্পন্দহীন চোখে পুলিনের দিকে চাহিয়া রহিল। পুলিন বলিতে লাগিল "আমি যাচ্ছি আমার স্থান আপনি পূর্ণ করুন। পিতার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করুন, জীবনে কখনো মিথ্যাকথা কইনি, আজ আপনাকে বাঁচাতে কেবল মিথ্যাই বলে যাব।"

যতীন কাঁপিতে কাঁপিতে পিতার পদস্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল—'জীবনে মদ খাব না,—জাতিহিংসা করব না, মায়ের সেবায় জীবন উৎসর্গ করব।"

রাম ভট্টাচার্য্যও পৈতা হাতে লইয়া বলিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, পৈতে ছুঁয়ে বল্‌ছি আজ থেকে ওকে তোমাদের দলে দিলুম নিজেও ঐ দলভুক্ত হলুম।"

পুলিনের দৃষ্টি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, বলিল, "বল বন্দেমাতরম্।"

সকলে সমস্বরে গাহিয়া উঠিল, 'বন্দেমাতরম্'। পুলিন দারোগা বাবুকে আনিতে আদেশ করিল। দারোগা আসিলে পুলিন বলিল, "লিখ্‌তে থাকুন;—আমি পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ী থেকে আস্‌ছি—রাত্রি অনেক। পথের ধারে গাছের তলায় দেখ্‌লুম যতীন বাবু মদের নেশায় এক একবার পড়ে যাচ্ছেন। আমায় বল্লেন, আমায় একটু বাড়ী রেখে এস ভাই—আমি ধ'রে তুল্‌তে গাছের একটা শিকড়ে বে'ধে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলুম—হাতের মদের বোতলটা আমার মাথার নীচে পড়ে গেল তার পর আমার কিছু মনে নেই জ্ঞান হলে দেখি আমি এখানে।"

দারোগা বাবু হাসিয়া জবানবন্দী লিখিলেন। যতীন এবার হাউ মাউ করিয়া উঠিল—গৃহের সকলের চোখেই জল। কাঁদিতে কাঁদিতে যতীন বলিল

"ভাই পুলিন, তুমি বেঁচে উঠ আমায় ক্ষমা ক'রে একবার বল আমি তোমার ভাই।"

পুলিন যতীনের দক্ষিণ হস্ত বুকের কাছে টানিয়া বলিল, 'তুমি আমার ভাই তোমরা রইলে!'

এমন সময় পুলিনের পিতা বলিল, "দারোগা বাবু একটু বাইরে যান, মেয়েরা আস্‌ছে।"

দারোগা বাহিরে গেলেন। অন্নপূর্ণা ছুটিয়া আসিয়া পুলিনের শয্যাপ্রান্তে বসিয়া ডাকিল, "ভাই।"

পুলিনের মুখ হর্ষোদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। বলিল, "দিদি, এই তোমার আর একটী ভাই। একে নাও আমি যাচ্ছি মা আমায় ডাক্‌ছেন। আমি আবার আস্‌ব দিদি, ভাই যতীন তোমরা যখন আমাকে ডাক্‌বে। মা কেঁদনা।"

"ও কি," বলিয়া প্রবোধ চীৎকার করিয়া উঠিল। রক্তে পুলিনের মাথার ব্যাণ্ডেজ ভিজিয়া নীচের বালিশ লাল হইয়া উঠিয়াছিল।

পুলিন বলিল, "আঃ কি করছ। মা কেঁদ না, আমি আবার আস্‌ব। দিদি তুমি বেঁচে থে'কো তুমি থাক্‌লে আমার মত অনেক পুলিন তৈরী হবে। মা—মা—"

কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। অন্নপূর্ণা পুলিনের মাথায় হাত দিয়া বলিলেন "যাও ভাই আবার তুমি এস—যেদিন সমস্ত বাঙ্গালী জাতিহিংসা ভু'লে তোমার আগমন প্রার্থনা কর্‌বে সেইদিন তুমি এসো। ততদিন ভাই আমার মায়ের কোলে তুমি সুখে বিশ্রাম ক'র।"

হারান বিশ্বাস স্থির চক্ষে দেখিলেন পুলিনের আঁখিপল্লব ধীরে ধীরে মুদিত হইয়া আসিতেছে। বিসর্জ্জনের বাদ্যে সমস্ত গ্রামখানি তখন মুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

বন্দী-জীবন

[শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্ন্যাল]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সেই দিনই জীবনে সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ সেনাবারিকে প্রবেশ করিয়াছিলাম। ইতি পূর্ব্বে এই সেনা বারিকেরই কত অস্ফুট রহস্য মনের আনাচে কানাচে কতবার কতরূপেই না আনাগোনা করিয়াছে, সেদিন সেনাবারিকের মধ্যে বসিয়াও মনে হইতেছিল যেন সেই সকল রহস্য আমাদের আশেপাশে ঘুরিয়া ফিরিতেছে; মাঝে মাঝে মনে হইতে লাগিল কত কালের সুখ স্বপ্ন যেন এই সেনা বারিকের সহিত জড়িত হইয়া রহিয়াছে।

লম্বা বারিকের মধ্যে দুই ধারে সারি সারি খাট পড়িয়া রহিয়াছে, কেহ খাটে বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ বই পড়িতেছে, কেহবা কার্য্যোপলক্ষে বারিকের মধ্যে যাওয়া আসা করিতেছে। আমরা বড় স্ফূর্ত্তিতেই পরিচিত সৈনিকদিগের সহিত কথা কহিতে ছিলাম বটে, কিন্তু মনের ভিতর যুগপৎ ভয়, বিস্ময়, ও আনন্দের এক বিচিত্র আলোড়ন হইতেছিল। প্রথমত যখন ইহারা আমাদের জন্য মিষ্টান্ন আনাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন তখন আমরা অনেক আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু শেষে ইঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া ক্ষান্ত হই; অথচ যখন মিষ্টান্ন আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল তখন মাঝে মাঝে ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা কিছু ফ্যাসাদ ঘটে, হয়ত বা কোনও কর্ত্তৃপক্ষকে আমাদের বিষয় সংবাদ দিতেই কেহ গিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই আশেপাশের সিপাহিরা আমাদের খাটে আসিয়া আমাদের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। আমরা সেনাবারিকে নিজেদের রাজপুত বংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। কেবল রাজপুত দিগের জন্যই বারানসীতে একটি স্কুল ও কলেজ ছিল। রাজপুত ভিন্ন আর কেহ সেখানে পড়িতে পাইত না, অথবা সেখানকার বোর্ডিংএ থাকিতে পাইত না। আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটির কথামত আমরা নিজেদের এই রাজপুত কলেজের ছাত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম। বারিকের সৈনিকেরা আমাদের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলে, আমরা অম্লান বদনে নিজেদের অমর সিং ও জগৎ সিং ইত্যাদি নাম বলিয়া দিলাম। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেমন একটু ভয় হইতে লাগিল পাছে নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে।

অবশ্য এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমরা নেহাৎ বাঙ্গালী পরিচ্ছদে সেখানে যাই নাই। অমাদের একজনের মাথায় পাগড়ি ও আর একজনের মাথায় টুপি ছিল এবং পরণের কাপড় হিন্দুস্থানী ধরণে পরাছিল। আমি পাগড়ি ভাল বাঁধিতে পারিতাম না বলিয়া অধিকাংশ সময় টুপিই পরিতাম।

আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটি বলিয়াছিলেন যে একজন হাবিলদারের সহিত আমাদের পরিচয় করাইয়া দিবেন। এই হাবিলদারটির সহিত নাকি তিনি পূর্ব্বেই আমাদের বিষয় লইয়া কথা কহিয়াছেন এবং হাবিলদারও নাকি আমাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছেন। ক্ষনিক পরে হাবিলদারের সহিত আমাদের পরিচয় হইল। ইহার নাম দিল্লা সিং। দিল্লা সিং একটু সঙ্কোচের সহিতই আলাপ করিলেন এবং একটু পরেই একটা কাজ সারিয়া এখনই আসিতেছি বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। আমার কিন্তু দিল্লা সিংকে তখন হইতেই কেমন যেন ভাল লাগেনাই, এবং যখন দিল্লা সিং কাজের অছিলায় কোথায় চলিয়া গেলেন, আমি সভয়ে পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটিকে অতি সন্তর্পনে জিজ্ঞাসা করিলাম "দিল্লা সিংকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় ত?" অবশ্য সৈনিকটি আমাকে আশ্বাস দিলেন যে না দিল্লা সিং ভাল লোক। আমার যে দিল্লা সিংকে ভাল লাগিতেছে না এ কথা সে দিনও আমি ইঁহাদের কাহারও নিকট গোপন রাখি নাই। সে দিন দিল্লা সিং যতক্ষণ না পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন ততক্ষণ কেবল ক্ষণে ক্ষণে আমার বন্ধুটিকে বলিতেছিলাম "কিহে, এ যে আসেনা, কোথায় গেল?" এবং পরস্পরের দিকে তাকাইয়া আমরা দুজনাই মুচকি হাসিতেছিলাম। যাহা হউক আমাদের সংশয় দূর হইল, সেদিনের মত দিল্লা সিং পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন। এমন সাধারণ কথাবার্ত্তায় সেদিন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল এবং পরে আমাদের সহিত নির্জ্জনে আলাপ করিবার মানসে দিল্লা সিং সেই পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটিকে লইয়া আমাদিগের সহিত সেনা বারিকের বাহিরে আসিলেন। দিল্লা সিং আমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন-এবং বারিকের আরও অন্যান্য সিপাহিদের সহিত এ বিষয় কথাবার্ত্তা কহিয়া রাখিবেন বলিলেন। দিল্লা সিং চলিয়া যাইবার পরও কিন্তু পূর্ব্ব পরিচিত সৈনিকটি আরও কিছুক্ষণ আমাদের সহিত রহিলেন। ইঁহাকে দিল্লা সিংএর প্রতি আমার সন্দেহের কথা পুনরায় বলায়, আমাদিগকে এবিষয় নিঃসন্দেহ হইতে বলিলেন। তখন একজন হাবিলদারকে দলে পাওয়া গিয়াছে মনে করিয়া মনে মনে বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিলাম। এইরূপ এই

সেনা বারিকে আমাদের যাতায়াত আরম্ভ হইল এবং মাস দুই একের মধ্যে অন্ততঃপক্ষে আমরা ১০।১২ বার এইখানে যাওয়া আসা করিয়াছি। এই সকল সৈনিক দিগেরও অনেকেই সহরে আমাদের বাসায়ও আসিয়াছেন এবং আমরাও প্রতিবারই রসগোল্লা ইত্যাদি নানারূপ বাঙ্গলা মিষ্টান্ন দ্বারা ইহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছি।

বোধ করি সারা ভারতে এমন কোনও সহর নাই যেখানে স্বদেশী বোমার দলের কথা কেহ না জানে; আমরাও যে সত্যই ঐরূপ বোমার দলের লোক ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এই সব সৈনিকদিগকে বাড়ীতে আনাইয়া ইহা-দিগকে বোমা, রিভলভার, মশার পিস্তল ইত্যাদি দেখান হইয়াছে। ঐরূপ কিছুদিন যাওয়া আসার পর ইঁহাদিগকে পাঞ্জাবের সৈনিকদিগের মধ্যেও যে কিরূপ বিপ্লবায়োজন হইতেছে, বলা হইল। ইঁহাদের নিকট এই সকল ব্যক্ত করায় যে বিপদের সম্ভাবনা কতখানি ছিল তাহা আমরা জানিতাম, কারণ ইহাদের নিকট হইতে যদি সরকার পক্ষ ঘুণাক্ষরেও এই সব জানিতে পারে ত পঞ্জাবের সকল আয়োজন পণ্ড হইয়া যাইবে। কিন্তু না বলিলেও সুবিধা হইত না; যখন ইহাদিগকে এইরূপ বলিলাম "যদি আমাদের কথায় বিশ্বাস না কর ত তোমাদের কাহাকেও অল্প কয়দিনের জন্য পাঞ্জাবে পাঠাইয়া দাও, আমরা আমাদের মতাবলম্বী সকল রেজিমেণ্টের সহিত তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিব" তখন আমাদের কথার উপর ইহাদের অনেকটা বিশ্বাস হইল। এই রূপে ক্রমে তিন চারিজন হাবিলদার ও জনকতক সিপাহীদের সহিত আমাদের পরিচয় হয়।

অধিকাংশ সময়ই আমরা সন্ধ্যার সময়ে অথবা সন্ধ্যার পর বারিকে যাইতাম। কিন্তু দুই একবার দিবা দ্বিপ্রহরেও যাইতে হইয়াছিল। এইরূপ একদিন আমরা দুইজন বারিকের অদূরে ঘন বৃক্ষশ্রেণীর ছায়াতলে অপেক্ষা করিতেছিলাম এবং আমাদের আর একজন বারিকের মধ্যে গিয়া দুই একজন সিপাহিকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন। বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন সঙ্গীটি ফিরিলেন না, তখন আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম, ভয় হইতে লাগিল বুঝিবা কোনও বিপদ ঘটিয়াছে, এবং যদি সত্যই কোনও বিপদ ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে আর এখানে এরূপে অপেক্ষা করাওত যুক্তিসঙ্গত নহে। কিন্তু সঙ্গী-টিকেইবা ফেলিয়া যাই কেমন করিয়া; ইত্যাদি নানা বিষয় আমরা আলোচনা করিতে লাগিলাম। যদিও আমাদিগের বিশেষ ভয় হইয়াছিল বটে তথাপি

ভয়ে আমরা অভিভূত হইয়া পড়িনাই, আমাদের বিশ্বাস এতটুকুও বিষাদের কালিমা আমাদের মুখে প্রকাশ পায় নাই। আর যতবারই বারিকে আমরা আসা যাওয়া করিয়াছি, কোন বারই সম্পূর্ণ নির্ভয়ে যাওয়া আসা করিতে পারি নাই, প্রতিবারই যখন নির্ব্বিঘ্নে ফিরিয়া আসিয়াছি তখনই ভাবিয়াছি, যাক্—আজকার দিনও নিরাপদে কাটিল; কিন্তু পুনরায় আবার কতবার বারিকে গিয়াছি। যাহা হউক অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন বন্ধুটি ফিরিলেন না তখন ভাবিলাম সত্যই বিপদ ঘটিল না কি! ভাবিলাম আমরা বাঙ্গালী, হাতে টুপি ও পাগড়ি, বারিকের অতি নিকটে গাছতলায় ভদ্রলোকের ছেলেরা বসিয়া রহিয়াছে, এই ঘন বৃক্ষরাজির পাশদিয়াই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে, যদি কোনও অফিসার আমাদিগকে এইরূপে এখানে বসিয়া থাকিতে দেখে ত কি ভাবিবে! ইত্যাদি প্রকারের নানা কথাই আলোচনা করিতেছি, এমন সময় দেখি বন্ধুবর দুইজন সিপাহিকে লইয়া আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। আমাদের মাথা হইতে যেন এক গুরু ভার নামিয়া গেল। ইহার পরে সকালেও দুই একবার এই বারিকের নিকট আসিয়াছি সিপাহিরা তখন কুচ কাওয়াজ করিতেছিল, আমাদেরই পরিচিত জনকএক হাবিলদার সেনা-পরিচালনা করিতেছিলেন দেখিয়া মনে হইল এই রেজিমেণ্ট আমাদেরই নিজস্ব। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই যেন এই সকল আয়োজন, সম্মুখদিয়া দুই একজন ইংরাজ অফিসারও অশ্বারোহণে চলিয়া গেলেন, কিন্তু কে কার খোঁজ রাখে, তখন ত কাহারও মনে কোনওরূপ সন্দেহের লেশমাত্রও ছিল না।

একদিনের কথা বেশ মনে আছে। তখন আর একবার পঞ্জাব হইতে ঘুরিয়া আসিয়াছি, বিপ্লবের আয়োজন সব সম্পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে, একদিন সেই ঘন বৃক্ষরাজির পদমূলে বসিয়া ইংরাজ সেনাবারিকের অতি সন্নিকটে ইংরাজ রাজত্বেরই উচ্ছেদকল্পে কি ভীষণ ষড়যন্ত্রই করা হইতেছিল। সেদিন জন তিনেক হাবিলদার ও নায়েক হাবিলদার ও আরও জন কতক সিপাহি সন্ধ্যার পর সেই বৃক্ষমূলে একত্র হইয়াছিলেন, আমরাও তিনজনা ছিলাম। এই বৃক্ষশ্রেণীর এক পাশ দিয়া রেলের লাইন এবং আর এক পাশ দিয়া গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। এই গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের পাশে খানিকটা মাঠের পর সেনা বারিক। জন কএক সিপাহি সড়কের ধারে বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া ছিলেন, যদি কাহাকেও সেদিকে আসিতে দেখেন অথবা ঐরূপ যদি কোনও সন্দেহের কারণ উপস্থিত হয় ত তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিবেন।

আমরাও যথাসম্ভব বৃক্ষের আড়ালে বসিয়া আসন্ন বিদ্রোহের দিন, সময় ও অন্যান্য অসংখ্য খুটিনাটির কথা আলোচনা করিতেছিলাম। মাঝে মাঝে এক কথায় ইহারা সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক ওদিক চাহিতেছিলেন। সেদিন যেন কত যুগের সঞ্চিত রোমান্স মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া সেই অন্ধকারের মাঝে আবছায়ার মত আমাদের সম্মুখে প্রতিভাত হইয়াছিল; সেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের পর আবার সেই তাণ্ডব নৃত্যের মহা আয়োজন হইতেছে ভাবিয়া দেহ মন পুলক-ভরে সত্যই রোমাঞ্চিত হইতেছিল। সেদিন কত আন্তরিকতার সহিতই না তাঁহারা আমাদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। ঐরূপ ঘন বৃক্ষরাজির পাদমূলে ঐরূপ গোপনে আমাদের সহিত আলাপ করিবার সময় যদি সৈনিক দিগেরই কেহ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সকল বিষয় গোচর করাইয়া দিত তাহা হইলে ত কোর্টমার্শলে তাঁহাদের প্রাণ লইয়া কতই না বিপন্ন হইতে হইত। এই জন্যই সেদিন বৃক্ষমূলে আসিয়াই তাঁহারা ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কারণ ঐরূপ আয়োজনের মধ্যে যেন লুকোচুরির ভাবটা অতি সহজেই চোখে পড়ে, সেই জন্য আমি ঐরূপ বৃক্ষের আড়ালে আত্মগোপন করিবার প্রয়াসের বিরোধী হইয়াছিলাম এবং ঐরূপে বার বার সন্দিগ্ধ ভাবে এদিক ওদিক তাকাইতে বারণ করিয়াছিলাম। আমরা যখন যেখানে ঐরূপ পরামর্শের জন্য নিজেদের মধ্যে মেলামেশা করিতাম, তখন ইহা আমরা সর্ব্বদাই লক্ষ্য রাখিতাম যেন সহজ সরল ভাবটা সর্ব্বসময়ে বজায় থাকে। সেদিন কিন্তু ঐরূপ বারণ করা সত্ত্বেও যখন সিপাহিরা আমার পরামর্শ গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ সতর্কতা অবলম্বন করাই শ্রেয় মনে করিলেন তখন মনে মনে এই ভাবিলাম, যে ইহারা নিতান্ত সরলপ্রাণে ও অত্যন্ত আগ্রহভরেই এখানে আসিয়াছেন, এবং সত্যই এই বিপ্লবের আয়োজনে ইহারা আন্তরিকভাবে যোগ দিয়াছেন। তাই এইরূপে আমাদের নিকট আসা যাওয়া করায় তাঁহাদের প্রাণ লইয়াও টানাটানি হইতে পারে ইহা জানিয়াও, এই সকল বিপদ ঘাড়ে লইয়াও তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়া আমাদের সহিত বিপ্লবায়োজনের পরামর্শ করিতেও পশ্চাদপদ হইতেন না। এইরূপ একবার নহে কতবারইনা তাঁহারা আমাদের নিকট আসিয়াছেন।

এদিকে যেমন আমরা সেনাবারিকে প্রবেশ লাভ করিলাম অন্যদিকে তেমনি বাঙ্গলা দেশ হইতে ফিরিবার অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই আমেরিকা প্রত্যাগত এক মারাঠা যুবকের আগমনে পাঞ্জাবের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ

পাতাইবার এক নূতন সূত্র পাওয়া গেল। এই মারাঠা ব্রাহ্মণটির নাম পিঙ্গলে। ইহার সম্পূর্ণ মারাঠী নামটি এখন মনে নাই। স্বদেশ প্রত্যাগমন কালে জাহাজেই ইহারা স্থির করেন যে পিঙ্গলে বাঙ্গলাদেশে গিয়া সেখানকার বিপ্লব দলের খোঁজ লইয়া পাঞ্জাবে আসিবেন। কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধুদের সাহায্যে কলিকাতায় বিপ্লবদলের অনেক লোকের সহিতই ইনি দেখা করেন; ফলে পাঞ্জাবের বিপ্লবায়োজনের কথা কলিকাতাময় রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। এদিকে তাঁহার কতিপয় বন্ধুর সহিত আমাদের দলেরও সম্বন্ধ ছিল এবং এই সূত্রে পিঙ্গলেকে আমাদের দলে পাওয়া গেল। আমাদের দলের সংস্রবে আসিবামাত্রই তাঁহাকে সোজা কাশী পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পিঙ্গলে বাঙ্গালাদেশে অনেকের নিকট বোমার সাহায্য চান। সে সময় সারা বাঙ্গলাদেশে প্রধানতঃ আমাদের কেন্দ্র হইতেই বোমা যোগান হইত। সেই জন্য বোমার খাতিরে পিঙ্গলের সহিত আমাদের বিশেষ ঘনিষ্টতা হইয়া যায়।

ঠিক এই সময় কাশীতে আমাদের মনে এইরূপ আশঙ্কা জাগিতেছিল, বুঝিবা পাঞ্জাবের সহিত পুনঃ সংযোগ স্থাপন নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া পড়িবে; ৫ই ডিসেম্বার পৃথ্বী সিংহের আসিবার কথা ছিল, পৃথ্বীসিং আসিলেন না এবং পাঞ্জাব হইতে আর কোন সংবাদ ও পাওয়া গেল না; এমন সময় পিঙ্গলেকে পাইয়া আমাদের মনে হইল যেন কতদিনের হারান নিধিকে ফিরাইয়া পাইলাম। পিঙ্গলেকে পাইয়া আমরা সত্যই বড় স্বস্তি বোধ করিয়াছিলাম। পিঙ্গলের সমুন্নত বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল গৌর কান্তি তাঁহার চোখ মুখের দীপ্তিতে সেই যে সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার আভাস, সেদিন তাহা আমাদের মনে এক সুগভীর রেখাপাত করিয়াছিল। ইঁহাকে দেখিয়া, ইঁহার সহিত কথা বার্ত্তা বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে ইঁহার দ্বারা আমাদের অনেক কাজ হইবে। অতীতের অনেক কথা স্মরণ পথে আসায় আজ যেন মনে হইতেছে যে দেহের সহিত মনের সম্বন্ধ যতটা ঘনিষ্ঠ বলিয়া আমাদের ধারণা, প্রকৃত পক্ষে সে সম্বন্ধ কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠতর।

পিঙ্গলের সহিত মনুষ্য জীবনের আদর্শ বিষয়ে নানা কথা হইতে হইতে কেমন করিয়া মনে নাই গীতার কথা আসিয়া পড়ে, এবং সেই সময় গীতার কএকটি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া যাওয়ায় আমরা বুঝিলাম গীতা তাহার কণ্ঠস্থ। তিনিও বলিলেন যে পূর্ব্বে যখন তিনি সাধু হইয়া গিয়াছিলেন তখন সমগ্র

গীতাটি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। ইহাতে পিঙ্গলের অতীত জীবনের ইতিহাসের কিছু জানিতে চাহিলে, পরিধানের জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে তিনি পূর্ব্বে কেমন করিয়া সাধু হইয়া ভারতের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন, এবং পরে কেমন করিয়া পুনরায় মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িবার জন্য আমেরিকা চলিয়া যান, তৎপরে সেখানে গিয়া কেমন করিয়া তিনি এই বিপ্লব দলের সংস্পর্শে আসেন, সব বলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

খদ্দরের গান

[শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত]

সাত পুরুষের মাটীর' পরে নিজের ঘরে যে ধন পাই,
সাত সাগরের ওপারে তা' কিসের দুঃখে ভিক্ষা চাই?
মা-বোন আপন হাতের দানে ঘুচা'তে চান দেহের লাজ,—
সোনার মুকুট ধূলায় ফেলে' কোথায় খোঁজ' রাংএর সাজ!—
হোক্‌না মোটা হোক্‌না খাটো, এ যে আমার দেশের দান—
খদ্দরে দে ভদ্র ইতর মাথায় তুলে' রাজার মান। ধ্রু ॥
দেশের ভুঁয়ে কাপাস থুয়ে' করিস্ কোকো চায়ের চাষ,—
সন্ধ্যা দেওয়ার সল্‌তাটুকু তা-ও না নিজের ঘরে পাস্!
এই দেশেরই বউ-ঝিয়ারি কাট্‌ত সুতা মস্‌লিনের,
আজ্‌ কেন সে বিবির বেশে পুতুল হ'য়ে রয় চীনের?
চর্‌কা ছেড়ে' খড়-পাকাটীর ব্যবসা চলে কোথায় আর,—
গলায় দড়ির কোঠা পেতে' দৃষ্টি হীনের চেষ্টা কার?
কোন্ দেশে কার্ পত্নী মরে লাজ-না-ঘোচার আপ্‌শোষে?
অন্নহীনের শব-ঢাকারও চীর জোটেনা কার্ দোষে?
কোন পুরুষের আঙ্গুল কাটা,—দূর হ'ল না জুজুর ভয়,—
দেড়শো বছর নুলোর মত তাই সয়ে' কার গোষ্টি রয়?
কোথায় পুরুষ কোথায় নারী,—ঘর-জুড়ে' দে চর্‌কা-তাঁত,
তিরিশ কোটীর লাগারে ভীড়, গড়্‌ক্ জোলা-তাঁতির জাত।

এক ক'রে দে গরীব-ধনী,—ঘুচুক্ বিলাস—ভূষার মান ;
ধর্ম্মে কর্ম্মে মনে মর্ম্মে মিলুক্ হিন্দু-মুসলমান ;
সখ্যে মিলুক্ রায়ৎ রাজা, ঐক্যে করুক্ দ্বন্দ্বক্ষয় ;
বাক্যে—সফল নির্ভয়ে বল্—'গান্ধী-মহারাজার জয় !'

সত্য ও মিথ্যা

[শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে থিয়েটার কেবল আনন্দ নয়, লোক শিক্ষারও সাহায্য করে। বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর বইখানা এক সময়ে বাঙ্‌লার ষ্টেজে প্লে হইত। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া এক ব্যক্তি ইংরাজ নীলকর অতিশয় কদাচারী বলিয়া ইহাতে লেখা আছে। কর্ত্তাদের হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল ইহাতে ক্লাস হেট্‌রেড নাকি এমনি একটা ভয়ানক বস্তু আছে যাহাতে অরাজকতা ঘটিতে পারে। অতএব, অবিলম্বে বইখানা ষ্টেজে বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটার-ওয়ালারা দেখিলেন ঘোর বিপদ। তাঁহারা কর্ত্তাদের দ্বারে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িলেন, কহিলেন, হুজুর, কি অপরাধ ? কর্ত্তারা বলিলেন লরেন্স ফষ্টর নামটা কিছুতেই চলিবে না, ওটা ইংরাজি নাম। অতএব, ওটা ক্লাশ হেট্‌রেড। থিয়েটারের ম্যানেজার কহিলেন, যে আজ্ঞা প্রভু। ইংরাজি নামটা বদলাইয়া এখনি একটা পর্ত্তুগীজ নাম করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডিক্রুজ্ না ডিসিল্‌ভা না কি এমনি একটা—যা মনে আসিল অদ্ভুত শব্দ বসাইয়া দিয়া কহিলেন এই নিন্।

কর্ত্তা দেখিয়া কহিলেন, আর এই "জন্মভূমি" কথাটা কাটিয়া দাও—ওটা সিডিশন্।

ম্যানেজার অবাক হইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর, এ দেশে যে জন্মিয়াছি।

কর্ত্তা রাগিয়া বলিলেন, তুমি জন্মাইতে পার কিন্তু আমি জন্মাই নাই। ও চলিবে না।

'তথাস্তু' বলিয়া ম্যানেজার শব্দটা বদ্‌লাইয়া দিয়া, প্লে পাশ করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। অভিনয় সুরু হইয়া গেল। ক্লাস হেট্‌রেড হইতে আরম্ভ

করিয়া মায় সিডিশন পর্য্যন্ত বিদেশী রাজ-শক্তির যত কিছু ভয় ছিল দূর হইল, ম্যানেজার আবার পয়সা পাইতে লাগিলেন, যাহারা পয়সা খরচ করিয়া তামাসা দেখিতে আসিল তাহারা তামাসার অতিরিক্ত আরও যৎকিংঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিল—বাহির হইতে কোথাও কোন ত্রুটি লক্ষিত হইল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুটা ছলনায় ও অসত্যের কালিতে কালো হইয়া রহিল। লরেন্স ফষ্টর বলিয়া হয়ত কেহ ছিল না, ম্যানেজারের কল্পিত অদ্ভুত পর্ত্তুগীজ নামটি মিথ্যা। ব্যাপারটাও তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ফল কোনমতেই তুচ্ছ নয়। স্বর্গীয় গ্রন্থকারের বোধ করি ইচ্ছা ছিল সে সময়ে বাঙ্‌লা দেশে ইংরাজ নীলকরের দ্বারা যে সকল অত্যাচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত হইত তাহারই একটু আভাস দেওয়া। ইহারই অভিনয়ে ক্লাস হেট্‌রেড জাগিতে পারে রাজ-শক্তির ইহাই আশঙ্কা। আশঙ্কা অমূলক বা সমূলক এ আমার আলোচ্য নয়, কিম্বা ইংরাজ নামের পরিবর্ত্তে পর্ত্তুগীজ নাম বসাইলে ক্লাস হেট্‌রেড বাঁচে কি না সেও আমি জানি না,—ইংরাজের আইনে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু যে আইন ইহারও উপরে যাহাতে 'ক্লাস' বলিয়া কোন বস্তু নাই তাহার নিরপেক্ষ বিচারে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করিলে যে বস্তু মরে তাহার দাম ক্লাস হেট্‌রেডের চেয়েও অনেক বেশি। সেদিন দেখিলাম এই ছোট ফাঁকিটুকু হইতে ছোট ছেলেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের সামান্য পাঠ্য পুস্তকেও এই অসত্য স্থান লাভ করিয়াছে। নূতন গ্রন্থকার আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন জিজ্ঞাসা করিলাম এই আশ্চর্য্য নামটি আপনি সংগ্রহ করিলেন কিরূপে ? গ্রন্থকার সলজ্জে কহিলেন প্রাণের দায়ে করিতে হয় মশায়। জানি সব, কিন্তু গরিব মানুষ, পয়সা খরচ করিয়া বই ছাপাইয়াছি তাই এই ফন্দিটুকু না করিলে কোন স্কুলে এ বই চলিবে না।

তাহাকে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম যে রাজ্যের শাসন-তন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যে দেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়, লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে দেশে মানুষে গ্রন্থকার হইতে চায় কেন ? সে দেশের অসত্য-সাহিত্য রসাতলে ডুবিয়া যাক্ না ! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ শক্তি নাই, গতি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গ-মঞ্চ জন্ম-পরিত্যক্ত পঙ্গু, অকর্ম্মণ্য ! সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। দেশের

রক্তের সঙ্গে তাহার যোগ নাই, প্রাণের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের আশা ভরসার সে কেহ নয়—সে যেন কোন্ অতীত যুগের মৃত দেহ। তাই পাঁচশত বছর পূর্ব্বে কবে কোন্ মোগল পাঠানকে জব্দ করিয়াছিল, এবং কখন কোন সুযোগে মারহাট্টা রাজপুতকে খোঁচা মারিয়াছিল সে শুধু ইহারি সাক্ষী এ ছাড়া তাহার দেশের কাছে বলিবার আর কিছুই নাই! দেশের নাট্যকার গণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে, তাই সত্যবর্জ্জিত নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনি লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। রুল ব্রিটানিয়া গাহিতে ইংরাজের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু 'আমার দেশ' আমার দেশে নিষিদ্ধ। এই যে আজ আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপিয়া ভাবের বন্যা ও কর্ম্ম ও উদ্যমের স্রোত বহিতেছে নাট্যাগারে তাহার এতটুকু স্পন্দন এতটুকু সাড়া নাই। দেশের মাঝখানে বসিয়াও তাহার দরজা জানালা ভয় ও মিথ্যার অর্গলে আজ এমনি অবরুদ্ধ যে দেশ-জোড়া এতবড় দীপ্তির রশ্মি-কণাটুকু তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই। কিন্তু কোন্ দেশে এমন ঘটিতে পারিত! আজ মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে বুকের রক্ত যাহারা এমন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, কোন্ দেশের নাট্যশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্য্যন্ত আজ এমন করিয়া বারিত হইতে পারিত! অথচ সমস্তই দেশেরই কল্যাণের নিমিত্ত! দেশের কল্যাণের জন্যই আজ দেশের নাট্যকার গণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁশ বাঁধা। এবং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে দেশের কবি, দেশের নাট্যকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে বাক্য, যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শক্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে এ কথাও আজ আমাদের মানিয়া চলিতে হইতেছে! কিন্তু এই নির্ব্বিচারে মানিয়া চলার লাভ লোকসানের হিসাব নিকাশের আজ সময় আসিয়াছে। এবং ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ক্ষুব্ধ করিয়া রাখিয়াছে? যে ইহা চালাইতেছে সে ছোট রয় নাই? আমরা দুঃখ পাইতেছি কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখ ভোগ সেই কি চিরদিন এড়াইয়া যাইবে? ঋণ পরিশোধের দুঃখ আছে,—আজ আমাদের ডাক পড়িয়াছে, কিন্তু দেনা শোধ করিবার তলব যেদিন তাহার ও ভাগ্যে আসিবে সেদিন তাহারই কি মুখে হাসি ধরিবে না!

ব্যাপারটা কাগজে কলমে লোকের চোখে কি ঠেকিতেছে ঠিক জানি না, হয়ত এই বাঙলা দেশেই এমন মানুষ ও আছেন যাঁহাদের কাছে আগাগোড়া

তুচ্ছ মনে হওয়াও বিচিত্র নয়, এবং যদি তাই হয়, তবুও আরও এমনি একটা তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এপ্রসঙ্গ এবারের মত বন্ধ করিব। সেদিন University Institute এ কবিতা আবৃত্তির ছেলেদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্ব্বদেশ পূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "এবার ফিরাও মোরে" শীর্ষক কবিতাটি নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল।

তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে এই সুদীর্ঘ কবিতার যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ,—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দ্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকার্য্য কে করিল!

ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্ব্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ছিল তাঁহারা।

মনে করিলাম, রত্ন ইহাঁরা চিনেন না, তাই, এও বুঝি সেই ছোব্‌রা আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা সমস্তই জানেন, তবে কিনা ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা সিডিশন্।

কহিলাম কে বলিল?

ছেলেটি জবাব দিল আমাদের কর্ত্তৃপক্ষরা।

যাক্;—বাঁচা গেল। কর্ত্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্ব্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল চিন্তা করিতে এ পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম আচ্ছা, তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না?

সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন পারা উচিত নয়, ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।

আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্ম্মল,—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে প্রকাশ্য সভায় তাহার আবৃত্তি সিডিশন্,—তাহা অপরাধের। এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে এবং কর্ত্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই, যে ফ্যাসাদ বাধিতে পারে। (ক্রমশঃ)

সুখের ঘরগড়া

দ্বিতীয় ভাগ।

(তারার কথা।)

যজ্ঞেশ্বরী পল্লীবাটী ছাড়িয়া কলিকাতা রওনা হওয়ার অব্যবহিত পরেই ভবানীপ্রসাদ পঞ্চুর সহিত দেখা করিতে গিয়া তর্কসিদ্ধান্তের কাছে শুনিলেন পঞ্চু যজ্ঞেশ্বরীকে লইয়া কলিকাতা গিয়াছে; অনুসন্ধানে জানিলেন তখনও আধঘণ্টা হয় নাই। যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা না পাওয়াতে ভবানী-প্রসাদ বড় ক্ষুণ্ণ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরী যে অকস্মাৎ তাঁহাকে না জানাইয়া চলিয়া যাইবেন ইহাই বেশী সম্ভব তবু যেন তাহার মনে হইল এই দেখা না হওটায় তাঁহারই ত্রুটী হইয়াছে; ভবানীপ্রসাদ মনে মনে তর্ক করিয়া দেখিলেন তখন বেলা এগারটা আন্দাজ, কিন্তু গাড়ী ১।১৫ মিনিটের সময় ষ্টেশনে পৌছিয়াও অন্ততঃ তিন কোয়াটার তাঁহাদের অপেক্ষা করিতে হইবে; সুতরাং তখনি রওনা হইলে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। বেশ বদলাইবার চিন্তা না করিয়া তিনি খালি গায়ে চটী পায়ে সরকারী সড়ক ধরিয়া ষ্টেশনের অভিমুখে চলিলেন।

নেউগী পুকুরের কাছে আসিয়া তত্রস্থ দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করিতে গেলেন এ পথ দিয়া দুটা পাল্কী ষ্টেশন অভিমুখে কতক্ষণ গিয়া থাকিবে। কিন্তু কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আগেই ঘাট হইতে একটা অস্ফুট বালিকাকণ্ঠ নিঃসৃত চীৎকার ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। অগ্রসর হইয়া দেখিলেন এক বৃদ্ধা রমণী পা পিছলাইয়া জলে পড়িয়া গিয়াছেন আর এক কিশোরী সুন্দরী বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাকে টানিয়া উপরে তুলিবার চেষ্টা করিতেছে। বাক্যব্যয় না করিয়া জুতা ফেলিয়া ভবানীপ্রসাদ ছুটিয়া গিয়া বৃদ্ধাকে টানিয়া তুলিলেন। বৃদ্ধা আঘাতে সংজ্ঞা হারাইয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল। বালিকা ভবানীপ্রসাদকে চিনিল; ভবানীপ্রসাদও তাহাকে কতকটা চিনিলেন তবু পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সে তাঁহাদেরই বাড়ীর বাউনঠাকুরাণীর মেয়ে সন্ধ্যামনি। কি করিয়া তাহার ঠাকুরমা পড়িয়া গেল জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শুনিলেন, জলে নামিতে গিয়া পিচ্ছিল ধাপে পা ফস্‌কাইয়া গিয়া পড়িয়া

গিয়াছে। সিড়ির ধাপের উপর বৃদ্ধাকে ধরিয়া বসাইলে সে বসিতে পারিলনা কাৎ হইয়া শুইয়া পড়িল; সন্ধ্যা ঠাকুরমাকে গতপ্রাণা ভাবিয়া হেট হইয়া কাণের কাছে মুখ দিয়া ব্যাকুল হইয়া বার কতক ঠাকুরমা ঠাকু'মা করিয়া ডাকিল, সাড়া না পাইয়া বুড়ী মরিয়া গিয়াছে স্থির করিয়া সন্ধ্যা বসিয়া পড়িয়া ফোপাইয়া ফোপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। ভবানীপ্রসাদ তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "কেঁদনা, তোমার ঠাকুরমার মন্দ কিছু হয়নি; শুধু অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন; এখনি জ্ঞান হবে"। এই আশ্বাস বাক্যে সন্ধ্যা যে কত শান্তিলাভ করিল তাহা তাহার সরল সজল দুটী চোখের কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল। ভবানী তাহাকে বলিল "চল একে বাড়ী নিয়ে যাই—তুমি আগে আগে পথ দেখিয়ে চলো কত দূরে বাড়ী?" "ওই বাগান পেরিয়ে,—কাছেই।" ভবানী বৃদ্ধাকে কোলে তুলিয়া লইয়া ঘাট পার হইয়া চলিল। ষ্টেশনে যাওয়ার মতলব ছাড়িতে হইল।

বাড়ী পৌছিয়া সন্ধ্যা দাওয়াতে একটা মাদুর বিছাইয়া ছিল, ভবানীপ্রসাদ বৃদ্ধাকে তাহাতে শোয়াইলেন; এবং সন্ধ্যাকে বলিলেন, "তুমি চট্‌করে একখানা শুক্‌না কাপড় এনে পরিয়ে দাও তোমার মা কোথা!" সন্ধ্যা বলিল, "মা তো আপনাদের বাড়ীর কাজে গেছে।" ঠিক সেই সময় সন্ধ্যার ছোট ভাই নীলু কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত; সন্ধ্যা তাহাকে বলিল, "নীলু মাকে শীগ্‌গির ডেকে আন্, ঠাকুমা জলে ডুবে গিছ্‌লো—"এই বলিয়াই সে ভবানীর মুখের দিকে তাকাইয়া অতি সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল "মাকে ডেকে আন্‌বে?" ভবানী উত্তর করিল—"নিশ্চয়ই; তা আবার বল্‌তে?" নীলু ছুটিয়া বাহির হইয়া মাকে আনিতে গেল। ভবানী জলমগ্ন অজ্ঞান ব্যক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করার পদ্ধতি প্রক্রিয়া জানিত তাহার প্রয়োগ ফলে বৃদ্ধার জ্ঞান সঞ্চার হইল। সন্ধ্যাকে দিয়া একটু গরম দুধ আনাইয়া খাওয়াইয়া দিলেন। তারপর তাহার গায়ে একটা মোটা কাঁথা চাপা দিয়া কাছে বসিয়া তারামণির আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিল ও সন্ধ্যার সহিত কথা জুড়িয়া দিল। একটা ঘটনা লক্ষ করিয়া ভবানী এই মেয়েটীর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইল। বৃদ্ধাকে লইয়া আসিবার সময় ভবানী চাতালে দণ্ডায়মান দোকানদারকে ডাকিয়া বলে—"ওহে আমার জুতো জোড়াটা রেখে দিওতো"। দোকানী নাকে তিলক পড়া মালা-ধারণ করা বৈরাগীনন্দন তখন মালা জপিতেছিল। এসময় গো-চর্ম্ম নির্ম্মিত জুতা স্পর্শে শুচিবিভ্রাট

ঘটিবার ভয়ে সে কথাটা তত গ্রাহ্য করিল না ; সন্ধ্যা তাহা লক্ষ্য করিয়াছিল ; সে নীরবে জুতা জোড়াটী ভবানীর অলক্ষ্যে তুলিয়া লইয়া সঙ্গে আনিয়াছিল।

তারামনি সংবাদ শুনিয়া ছুটিয়া বাড়ী আসিলে, ভবানী তাহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া এবং তাহার পিসি তখন ভাল আছেন, আর ভয় নাই আশ্বাস দিয়া চলিয়া যাইবে এমন সময় সন্ধ্যা জুতা জোড়াটী আনিয়া নতমুখে ভবানীর পায়ের কাছে ধরিয়া দিল। ভবানী জানিত জুতা দোকানেই আছে অথচ এখানে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "জুতা কোথা হতে এলো ?" সন্ধ্যা তেমনি নতমুখে মৃদুভাবে বলিল—"দোকানী তুল্‌লেন না দেখে আমি নিয়ে এসেছিলাম"। "ছিঃ কেন আন্‌তে গেলে হাতে করে ? তোমার কাছে যে খাবার জলের কলসী ছিল ?" সন্ধ্যা কি উত্তর দিবে ? তারামণি কৃতজ্ঞতা ভরা গদ্‌গদ্ স্বরে বলিল—"তাতে দোষ হয় নি কিছু কলসীর ও-জল আমাদের কাছে আজ গঙ্গাজল তুল্য হয়েছে"। ভবানী উত্তর শুনিয়া লজ্জিত হইয়া "না ও কথা বলনা বাউন মা"। বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ভবানীপ্রসাদ চলিয়া গেল। পথে আসিতে এই দুঃখিনী বিধবার সংসারটীর আর সংসারের মধ্যে এই কন্যারত্নটীর কথা ভাবিতে লাগিলেন! খুবই সদ্বংশের মেয়ে যে এই মা ও মেয়ে তা আজ একটী ঘটনায় তাহার প্রমাণ তিনি পাইলেন।

(ক্রমশঃ)

ডালি

[ওকাকুরার Ideals of the East হইতে]

ইউরোপ আজ বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক শক্তির বলে তোলপাড় হয়ে রয়েছে কিন্তু তাই ব'লে এসিয়ার শান্ত সরল জীবনকে তার সঙ্গে তুলনা কর্ত্তে লজ্জা, ভয়, সঙ্কোচের কোন দরকারই নাই। আমাদের এই বাণিজ্য বিপুল প্রাচীন জগৎ, গ্রাম্য শিল্পী ও পণ্য ব্যবসায়ীর এই কর্ম্ম মুখের ভূভাগ,—যেখানে গ্রামে গ্রামে হাট বসে, যেখানের দেবতার উৎসবে মেলা হয় দেশের পণ্য সম্ভার বুকে করে ছোট ছোট তরণী বিশাল নদ নদী মালার উপরে ভেসে ভেসে বেড়ায় যেখানে প্রাসাদে ও রাজ সভায় বণিককুল আপন আপন মণিরত্ন ও অন্যান্য মহার্হ বস্তু সম্পদে যবনিকার অন্তরালবর্ত্তিনী "ললিতলবঙ্গলতা" ললনাগণকে রত্ন সমুদয় ক্রয় করবার জন্য প্রলুব্ধ করে—আমাদের সে জগৎ এখনও সম্পূর্ণ অচেতন হয়ে পড়ে নাই। বাইরে তার আকৃতির পরিবর্ত্তন যতই হ'ক না কেন একটা গুরুতর ক্ষতি না হওয়া পর্য্যন্ত এসিয়া তার আধ্যাত্মিকতাকে ম'রতে দিতে পারে না। কেন না সমগ্র শ্রমশিল্প, যুগযুগান্তরের পৈত্রিক সম্পত্তি, এখনও তারই, এবং সম্পত্তি ত্যাগ কর্‌তে হ'লে, এর সঙ্গে, কেবল যে শিল্প সৌন্দর্য্য হারাতে হবে তা নয়, শিল্পীর আনন্দ, তারূপ দর্শনের স্বাতন্ত্র্য ও সেই সৌন্দর্য্যের মানুষ তৈরি করবার সমগ্র ক্ষমতা এ সমস্তই লোপ পাবে। স্বহস্ত নির্ম্মিত তন্তুজালে নিজেকে ঘিরে ফেলার অর্থ আপন ঘরে আপনাকে বদ্ধ ক'রে রাখা—আত্মশক্তির বিকাশের জন্য।

কালের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে তাকে গ্রাস করাই সার ধর্ম্ম। সেই বাষ্পীয় যন্ত্রের তাণ্ডব আনন্দ এসিয়া এখনও জানে না, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজকের ভিতর দিয়ে প্রকৃত ভ্রমণের নিগূঢ় সার পদার্থটীকে সে বাঁচিয়ে রেখেছে ; যিনি গ্রাম্যগৃহিণীগণের নিকটে ভিক্ষা করে অথবা সন্ধ্যা সমাগমে গাছের তলে বসে স্থানীয় যুবক দলের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ ক'রে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান সেই ভারতীয় সন্ন্যাসীই প্রকৃত ভ্রমণকারী। পল্লী মায়ের শান্ত কোমল সহজ শোভাই তাঁর কাছে একমাত্র দৃশ্য নয়। তিনি অন্তত মুহূর্ত্তের জন্যও একদিন না একদিন সংসারের সুখ দুঃখের বোঝা নিজেই বহন করেছেন ; তার হৃদয়ে আজও যে ভালবাসা ও কমনীয়তার মধু রয়েছে,

তা মানবের উপর, তার জন্মগত সংস্কারের উপর, আচার পদ্ধতি সমাজ রীতির উপর রক্ষিত হয়ে পড়ে। সেই মহামানবের সঙ্গে একটা সংযোগের ডোর এই পল্লীশোভা গেঁথে দেয়।

আবার দেখি জাপানে কৃষকভ্রমণকারী কোন সুন্দর জায়গায় গেলে, ছোটগান তৈরী না ক'রে—সরল সৌন্দর্য্য সৃষ্টি না ক'রে, সেখান থেকে চলে যায় না।

এই রকম অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে প্রাচ্যের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা পরিণত ও জীবন্ত হয়ে ফুটে ওঠে, শান্ত বীর্য্যবান মানবতার ভাব ও চিন্তাকে একতানে ঝঙ্কৃত ক'রে তোলে। প্রাচ্যে এই রকম আদান প্রদানের মধ্য দিয়েই মনুষ্যের পরস্পর সংস্রবের অভিব্যক্তি ; মুদ্রিত পুস্তকই এখানে সভ্যতার চিহ্ন নয়। :

বৈষম্যের দীর্ঘধারা এমনি ক'রে যতদূর ইচ্ছা জড়ান যেতে পারে ; কিন্তু এসিয়ার গৌরব শুধু তাতেই নয় ;—এ হ'তে আরও একটা জ্বলন্ত সত্যের দিক আছে, এসিয়ার শুভ্রগর্ব্ব, প্রত্যেক হৃদয়ে যে শান্তির স্পন্দন হচ্ছে, সেই স্পন্দনে সেই প্রাণ বায়ুতে, এসিয়ার গৌরব সেই সাম্যের মহিমাময় একতায় যার জন্য সম্রাট ও কৃষক একপ্রাণ ; এসিয়ার বিমল অহঙ্কার সেই সুমহান্ একত্ববিশ্বাসে, প্রেম, ও বিশ্বজনীন সচ্ছলতা যার ফল, যার ফলে জাপান সম্রাট তাকাকুরা তুষারশীতল রজনী অনাবৃত বস্ত্রে যাপন ক'রতেন, কেননা তাঁর দরিদ্র প্রজা শীতে জড়ীভূত, অথবা তাই সে আহার পরিত্যাগ ক'রেছিলেন কেন না প্রকৃতিপুঞ্জ দুর্ভিক্ষ ক্লেশে পীড়িত। বিশ্বের শেষ পরমাণু পর্য্যন্ত যতক্ষণ অনন্তের রাজ্যে যেতে না পারে ততক্ষণ পর্য্যন্ত নির্ব্বাণলাভ ক'রতে না দিয়ে যে ত্যাগের স্বপ্ন বোধিসত্ত্বকে বিচিত্র ক'রে তুলেছে তাতেই সেই গৌরব। যে স্বাধীনতা কালিমাময়ী মূর্ত্তিতে মহত্ত্বে 'স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলা' ক'রে তোলে, ভারতীয় রাজাকে যোগীর ন্যায় বেশ ভূষায় কঠোরতা শিখিয়ে দেয় ; চীনদেশে এমন রাজসিংহাসন গ'ড়ে তোলে যার অধিপতিকে, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিপতিকে, কখন তরবারি ব্যবহার ক'রতে হয় না, সেই স্বাধীনতার উপাসনাতেই ত এসিয়ার গৌরব।

এই সবই হচ্ছে এসিয়ার জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্যকলার গুপ্ত আত্মশক্তি। প্রাক্তন সংস্কার থেকে বিচ্যুত হয়ে, ভারতবর্ষ আজ জাতীয়তার সারভূত ধর্ম্মজীবন বিসর্জ্জন ক'রলে যা নীচ, যা মিথ্যা, ও যা নূতন তারই উপাসক হয়ে প'ড়বে। চীন, নৈতিক সভ্যতার বদলে লৌকিক সভ্যতায় মত্ত হয়ে উঠে,

প্রাচীন আত্ম সম্মানও নীতিকে বিসর্জ্জন দেবে,—যে নীতি অনেক কাল আগেই দেশীয় বণিকদের মুখের কথাকেই পশ্চিমের লিখিত দলিলের মত প্রামাণ্য করে তুলেছিল এবং কৃষি সম্পৎ একার্থবোধ বা শব্দের মত ক'রে দিয়েছিল। তা হ'লে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এসিয়ার আজকার কর্ত্তব্য—এসিয়ার রীতিনীতি রক্ষা করা ও যা নষ্ট হয়েছে তা ফিরিয়ে নিয়ে আসা। কিন্তু তা ক'রতে হলে, তাদের প্রথমে নিজে নিজে ঐ আচার পদ্ধতির জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে নিতে হবে। কারণ যা অতীতের ছায়া, তাই আবার ভবিষ্যতের আশা। বীজে যে শক্তি নিহিত আছে, তা থেকে বেশী শক্তি কোনও গাছের হ'তে পারে না। চিরদিন অন্তর্মুখী হওয়াটাই জীবন। কত ভগবদভক্তই না এ সত্যের প্রতিধ্বনি ক'রেছেন, Delphic oracles এর সব চাইতে বড় কথা "নিজেকেই জান" "তোমাতেই সব" এই হচ্ছে কন্‌ফুসিয়সের শান্তির বাণী "আত্মানং বিদ্ধি তত্ত্বমসি" এই একই সত্যের আহ্বান নিয়ে ভারতে যে একটি কথিত প্রচলিত রয়েছে তা আরও প্রাণস্পর্শী। বৌদ্ধেরা বলেন যে একদিন ভগবান্ বুদ্ধ শিষ্যগণকে নিয়ে যখন বসেছিলেন তখন মহাজ্ঞানী বজ্রপাণি ভিন্ন আর সকলের চোখ হঠাৎ জ্বালা মালায় ঝলসে দিয়ে এক বিরাট পুরুষের আবির্ভাব হ'ল। তিনি মহাদেব শিবশঙ্কর। সাথের সাথীরা অন্ধ হয়ে পড়লো দেখে বজ্রপাণি ভগবানেরদিকে চেয়ে বললেন "দেব বলুন আমাকে এতদিন সমগ্র নক্ষত্র ও দেবতার মধ্যে—সংখ্যায় যারা গঙ্গার বালুকণার সমান, তাঁদের মধ্যে এই জ্বলন্ত শরীর দেখতে পাই নাই কেন? ইনি কে?" বুদ্ধ বললেন "তিনি তুমিই ;" এবং বজ্রপানি তখনই ভূমায় মিশিয়ে গেলেন।

এই আত্মবোধের সামান্য কণিকাই জাপানকে পুনর্জ্জীবিত করেছে এবং যে ঝড়ে প্রাচ্যজগতের এতটা ডুবে গিয়েছে সেই ঝড় সইবার শক্তি দিয়েছে। সেই আত্মজ্ঞানের নবজাগরণই এসিয়াকে ধৈর্য্যশালী ও বীর্য্যবান করে গড়ে তুলবে চারিদিক থেকে আশার শতধারা বর্ত্তমান যুগকেবিহ্বল করেছে। বহু তত্ত্ব সমাচ্ছন্ন "মোহন্ধ" রাজত্বের সময়েও জাপান আপন ভবিষ্যতের সূত্রটিকে ঠিক করে ধরতে পারে নাই, তবে অতীত নির্ম্মলও বাধারহিত ছিল।

* * * *

কিন্তু আজ প্রাচ্যজগতের ভাবরাশি আমাদের অস্থির কচ্ছে, সত্যই রাজদ্রোহের Revolution সঙ্গে সঙ্গে জাপান তার প্রার্থিত নবজীবন নিয়ে অতীতে ফিরে গিয়েছে বৈচিত্র্যময় প্রতিক্রিয়া হয়েছে, যেন সত্যের পুনঃ

প্রতিষ্ঠার মত কেননা আশিকগো যা আরম্ভ করেছিলেন সেই কলা সৌন্দর্য্যের প্রকৃতির নিকট আত্মত্যাগ আজ এসে জাতির নিকট মানুষের নিকটে দাঁড়িয়েছে।

আমরা স্বভাবতই জানি যে, আমাদের ভবিষ্যতের পথের খোঁজ আমাদের ইতিহাসেই আছে এবং আমরা অন্ধের মত সেটাকে খুঁজে নেবার চেষ্টা করি। কিন্তু যদি ভাব সত্য হয়, যদি অতীতেই নবজীবনের অমৃত উৎস লুকিয়ে থাকে, আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে এই মুহূর্ত্তে একটা মহান্ নবশক্তির প্রেরণার বিশেষ দরকার, কেননা বর্ত্তমানের নীচতা ও ক্ষুদ্রতার জ্বালা, জীবন ও সৌন্দর্য্যকে শুষ্ককণ্ঠ করে ফেলেছে।

সৌদামিনীর যে প্রভাময় তরবারি খানা আজ অন্ধকারকে দ্বিখণ্ডিত ক'রে ফেল্‌বে তারই অপেক্ষায় বসে আছি, এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা ভাঙ্গতে হবে, নববলের বারি সম্পাত ধরণীর শুষ্ক হৃদয় সরস হ'য়ে উঠবে তবেইত তার হৃদয় নবীনকুসুমের পেলবকান্তিতে শোভাময় হতে পারবে। কিন্তু সত্যের মহান্ আহ্বান শুনতে পাওয়া যাবে এসিয়া থেকেই, জাতীয়তার প্রাচীন রাজপথে চলেই।

চাই ভেতর হতে জয়, অথবা বাহির থেকে এক মহান্ মৃত্যু।

নারায়ণের পঞ্চ প্রদীপ।

বীরভাবের কথা

[লেখক—শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত]

খৃষ্টের মুখ লইতেও একথাটী আমরা শুনিতে পাই—I came not to send peace, but a sword—তিনি শান্তিস্থাপনের জন্য আসেন নাই, তিনি আসিয়াছেন অসি হাতে যুদ্ধের জন্য। শুধু কথায় নয় কার্য্যতঃ ও এক সময়ে কশাঘাতে তিনি যেরুসালেমের বণিকদিগকে তাহাদের পণ্যশালা হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। তবুও খৃষ্টের ধর্ম্ম শক্তিধর্ম্ম ছিল না, তাহা ছিল অতিমাত্রই প্রেমের ধর্ম্ম। আবার বুদ্ধ যাঁহাকে আমরা জানি করুণারই অবতার বলিয়া, যিনি বিশ্বের দুঃখে কাঁদিয়া ফিরিয়াছিলেন, তিনি কিন্তু

প্রকৃতপক্ষে ততখানি কান্তস্বভাব ছিলেন না, যতখানি ছিলেন শক্তির বিভূতি—শুধু তাহাই নয়, শাক্যসিংহের মধ্যে যে শক্তি খেলিয়াছে তাহা শান্ত রসাস্পদ বলিয়া মনে হয় না, তাহার প্রতিষ্ঠা তাহার প্রাণ বীরভাব, এমন কি একটা রুদ্রভাবেরই মধ্যে। তাঁহার সাধন-প্রণালী, তাঁহার কর্ম্মের ভঙ্গিমার মধ্যে কেমন এক তপ্ত তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি যখন বোধিদ্রুমতলে প্রায়োপবেশনে বসিলেন, যখন তাঁহার অন্তরাত্মা গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল, "এই আসন গ্রহণ করিলাম, শরীর যায় আর থাক সিদ্ধি ব্যতিরেকে এখান হইতে উঠিব না"—ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং—তখনই পাই বুদ্ধের প্রাণের ধর্ম্মের ইঙ্গিত। পুরাতন বৈদিকধর্ম্মকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিবার জন্যই তিনি আসিয়াছিলেন; কোন ভগবান, কোন দেবতা, কোন কিছু সত্তার উপর ভর করিয়া তিনি তাঁহার সাধনাকে দাঁড়াইতে দেন নাই—তাঁহার ধর্ম্ম নিরালয়, এক উগ্র তপঃশক্তির বলে ক্ষণিকবেদনাসৃষ্টি এই যে সৃষ্টি তাহাকে ধ্বংস করিয়া নির্ব্বাপিত হওয়া, শূন্যে মিলিয়া যাওয়াই নিঃশ্রেয়স।

মানুষ কি বলে, কি ভাবে, কি চায়, কি করে, সেই বস্তুর মধ্যে প্রকৃত মানুষটিকে ঠিক ততখানি পাই না, যতখানি পাই সেই বলার, সেই ভাবার সেই চাওয়ায়, সেই করার ভঙ্গিমার মধ্যে। অন্তরাত্মার যে মূলভাব, যে বিশিষ্ট আবেগটী তাহা অঙ্কিত হইয়া চলিয়াছে স্থূল উপকরণাদির গঠনের চলনের ভঙ্গিমারই মধ্যে—মানুষকে চিনিতে হইলে, পূর্ণরূপে চিনি এই জিনিষটির সহায়ে। কারণ আর সকল জিনিষ মানুষ সহজেই আহরণ করিতে পারে, বাহির হইতে অন্যের নিকট হইতে জ্ঞানতঃ হউক অজ্ঞানতঃ হউক ধার করিয়া লইতে পারে—আর সব জিনিষ সম্বন্ধে মানুষ ভাণ করিতে পারে, আপনাকে লুকাইতে পারে কিন্তু ভঙ্গীর মধ্যে সে চিরদিনই আসিয়া ধরা পড়ে। তাই ফরাসী মনীষী বুফন (Buffon) বলিয়াছেন—Le style c'est l'homme—রচনার যে ভঙ্গী সেখানেই রহিয়াছে সমগ্র মানুষটি। জগৎকে সে কোন দৃষ্টিতে দেখিতেছে, তাহার জীবনের শাস্ত্র কি তন্ত্র কি সমস্তই প্রতিফলিত এই style এর মধ্যে। এইখানেই ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহার প্রাণের ধর্ম্ম; এখানে যাহা নাই সে সব হইতেছে তাহার বুদ্ধির ধর্ম্ম।

বুদ্ধির ধর্ম্ম আর প্রাণের ধর্ম্ম—মানুষের আছে এই দুই ধর্ম্ম। কিন্তু ইহাদের একটী মানুষের স্বভাবসিদ্ধ আর একটী আরোপ মাত্র, অন্যূনপক্ষে তাহার

সাধ্য বস্তু। একটী কল্পনার রচনা আর একটী নৈসর্গিক সৃষ্টি, একটীকে ধরিতে প্রয়াস করিতে হয়, আর একটী অযত্ন সুলভ, আপনিই আসিয়া ধরা দেয়। মানুষের স্বরূপ বুঝিতে হইলে, জাগতিক প্রতিষ্ঠানে তাহার মূল্যটী নিরূপণ করিতে হইলে এই প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে যথাযথ মানদণ্ড। বুদ্ধির ধর্ম্মটী যতখানি প্রাণের সহিত একীভূত হইয়াছে ততখানিই সে ধর্ম্ম জাগ্রত, জীবন্ত, কর্ম্মকুশল। প্রকৃতপক্ষে, ধর্ম্মের অর্থ এই প্রাণের ধর্ম্ম। প্রাণের ধর্ম্মই হইতেছে স্বধর্ম্ম, বুদ্ধির ধর্ম্মের সহিত পরধর্ম্মেরই একটা সাজাত্য আছে।

হইতে পারে প্রাণের ধর্ম্মটী অপেক্ষা বুদ্ধির ধর্ম্মটীই উচ্চতর মহত্তর। বুদ্ধির ধর্ম্ম দেখাইতেছে আমার আদর্শকে, আমি কি হইতে চাহিতেছি। আমি কি হইতে চাই, আমার আকাঙ্ক্ষা কি তাহার একটা মূল্য আছে, বিশেষ মূল্যই আছে—কিন্তু আশার কল্পনার যে মর্য্যাদা আমার নিভৃত ব্যক্তিগত সাধনার পক্ষে তাহা যতই বৃহৎ হউক না কেন, যতক্ষণ সে সব আমার প্রাণে সজীব হইয়া উঠে নাই ততক্ষণ সত্য হইয়াও উঠে নাই, ততক্ষণ আমার অন্তরাত্মার সৃষ্টি তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে না, বিশ্বের সহিত আমার যে প্রকৃত সংযোগ তাহা সে সকলের মধ্য দিয়া নহে, তাহার আমার প্রাণের মধ্যে দৃঢ়: প্রতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে যে সত্য তাহারই মধ্যে। কিন্তু বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়া আমি আমার যে একটা ধর্ম্ম খাঁড়া করি, জগৎ রহস্য সম্বন্ধে যে শাস্ত্র রচনা করি তাহা যে আবার আমার প্রাণের ধর্ম্ম প্রাণের তন্ত্র হইতে উচ্চতর হইবে এমন কোন কথা নাই। অনেক সময়ে এমনও দেখিতে পাই প্রাণেরই মধ্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে একটা সমুচ্চের উপলব্ধি, আর বিচার বুদ্ধিই তাহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, বিকৃত করিয়া দিয়াছে। প্রাণের যে সহজাত দৃষ্টি দিয়া জগৎ দেখিয়াছি, তাহাই সত্যতর, তাহাই উদার মহৎ বুদ্ধির কারুকার্য্যই তাহাকে মলিন বিরূপ করিয়া ফেলিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা প্রায়ই দেখি কবি তাঁহার কাব্যে যখন আপনার প্রাণটিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তখনই তিনি পাইয়াছেন, দেখাইয়াছেন খাঁটি জিনিষটি আর সেই কবিই যখন আপনাকে সমালোচনা করিতে বসিয়া গিয়াছেন কাব্যরচনা সম্বন্ধে শাস্ত্ররচনা করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন তখনি তিনি সত্য হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

বুদ্ধির ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বদাই তাই মিশিয়া থাকে কেমন একটা মিথ্যাচারের

অবাস্তবতার আভাস। সেখানে পাইনা সত্য ধর্ম্মের অটুট অব্যর্থতা অকুণ্ঠিত ঋজুতা। কথায় বস্তুতে সেখানে প্রাণধর্ম্মের যতখানি পরিত্যাগ করি না কেন, কথার ভঙ্গিমায় বস্তুর গঠনে সেটুকু কোন না কোন প্রকারে বর্ত্তিয়া থাকিবেই। এমনও হয় যে যে-বস্তুটি প্রাণে নাই ঠিক সেই বস্তুটীই বুদ্ধি অতিমাত্র আঁকড়িয়া ধরে। স্বভাবের এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রাণের তন্ত্রীতে সহসা একটা ভিন্ন সুর বাজিয়া উঠে। কিন্তু কান পাতিয়া শুনিলে আমরা অনুভব করিব সে সুর কেমন তাল কাটিয়া চলিয়াছে তাহাতে রহিয়াছে একটী বৃথা আরম্বর নতুবা তাহা হইতেছে ক্ষীণ প্রতিধ্বনি মাত্র। মানুষ বুদ্ধির ধর্ম্ম দিয়া যাহাই ধরিতে চাহে না কেন, একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে দেখিব তাহার ভাবে ভঙ্গিমায় ইঙ্গিতে প্রাণেরই ধর্ম্ম বাহির হইয়া পড়িতেছে, প্রাণের ধর্ম্ম অজ্ঞাতসারে কেমন তাহাকে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। মানুষ যাহা হইতে চায় তাহা অপেক্ষাও বলীয়ান হইতেছে মানুষ যাহা হইতেছে।

(২)

প্রত্যেক মানুষই এক একটি ভাবের বিগ্রহ। এক একটি মূলভাব যাহা তাহার প্রাণে তাহার ধাতুতে তাহার রক্তের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে তাহাই তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, আর সকল ভাব ইহাকেই অনুসরণ করিতেছে, ইহারই ছায়ায় গড়িয়া উঠিতেছে। বীরভাব, তপঃশক্তি, ক্ষতিতেজ এইরূপ যাহার প্রাণের ধর্ম্ম তাহার সকল কথাই ইহারই ব্যঞ্জনা লিপ্ত রহিয়াছে। বিপরীত কথা বলিলেও সেখানে পাইব এই ভাবেরই একটা ইঙ্গিত। আর যে মানুষের মূল প্রকৃতিতে এটি নাই যেখানে কোমলতারই আধিক্য সেখানে সকল বীরত্ব সকল দর্পের মধ্যেও পাইব এই কোমল ভাবই। শেলী ছিলেন স্বাধীনতার নবী, অত্যাচারের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তিনি চিরকাল যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছেন। বিপ্লবকেও আহ্বান করিতে তাঁহার কিছু ইতস্ততা ছিল না। তবুও শেলী নারী-সুলভ মাধুর্য্য ও কোমলতারই প্রতিমূর্ত্ত। স্ত্রীরত্নের মহিমা তাঁহার বিশেষরূপে জানা থাকিলেও তাঁহার অধিগত জিনিষটি ছিল কমনীয়তা Helles অথবা Revlt of Islamএর প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে শেলী —প্রকৃত শেলী নাই। প্রকৃত শেলী হইতেছেন তিনি যিনি পান (Pan) দেবতার স্তুতি করিয়াছেন, যিনি স্কাইলার্কের বন্দনা করিয়াছেন, যিনি গাহিয়াছেন প্রেমের তত্ত্ব (Love's philosophy) শেলী যখন বলিতেছেন—

Arise arise arise
There is blood on the earth that denies ye bread !

তখন সেখানে তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মাটি তিনি ধরিয়া দেন নাই। কিন্তু যখন তিনি বলিতেছেন--

Like a cloud big with a May shower
My soul weeps healing rain
In thee, thou withered flower--

তখন তাঁহার প্রাণের সমস্ত নিগূঢ়তম রহস্যটিই ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে আমরা বোধ করি। শেলীর সহিত তুলনা করুন বায়রণ। বায়রণও ছিলেন স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের উপাসক—আর সেই জন্যই উভয়ের মধ্যে বিশেষ সখ্যভাব স্থাপিত হইয়াছিল কিন্তু দুইজনের মধ্যে কি প্রভেদ? বায়রণ ছিলেন শক্তির বীর্য্যের বরপুত্র—তাঁহার কথার ভঙ্গিমায় কি এক তপঃশক্তি বিচ্ছুরিত হইতেছে॥ তিনি যখন বলিতেছেন—

The Assyrian came down like a wolf on the fold—

অথবা—

Jehov's vessels hold
The godless heathen's wine !

তখন যে সুর আমাদের শ্রবণে প্রতিধ্বনিত হয় তাহার তুলনা শেলীতে কিছু নাই, তখনই আমাদের সম্যক বোধগম্য হয় প্রকৃত বীরভাব জিনিষটি কি। এই সঙ্গে আর একজন স্বাধীনতার মুক্তির উপাসকের কথা মনে পড়িতেছে। তিনি শক্তিকে বীরত্বকে তাঁহার ধর্ম্ম তন্ত্র হইতে বর্জ্জিত করেন নাই। তিনি শেলীর মত অতিমাত্র নারীপ্রকৃতি ছিলেন না, তাঁহার স্বভাবে পুরুষোচিত একটা সামর্থ্য ধৈর্য্য স্থৈর্য্যের ইঙ্গিত পাই। তবু কিন্তু বায়রণ হইতে তাঁহারও কতখানি প্রভেদ। কিন্তু বায়রণ হইতে তাঁহারও কতখানি প্রভেদ। আমরা বলিতেছি মহাকবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা। যে Words worthএর মুখ হইতে আমরা শুনি বাহির হইয়াছি।

—Liberty shall soon, indignat raise
Red on the hills his beacon's comet blaze

—যিনি ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে প্রথমে লিখিয়াছিলেন মুক্তি, তিনিই পরে সে বিপ্লবের ঘোর বিকট মূর্ত্তি দেখিয়া তাহার সহিত আর সহানুভূতি করিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণ রুদ্রের তাণ্ডব নৃত্যের তালে আর তরঙ্গায়িত হইতে চাহিল না। বস্তুতঃ বায়রণের মত ওয়াড্‌সওয়ার্থের চণ্ড ক্ষাত্র প্রকৃতি ছিল না। তাঁহার মধ্যে প্রধান ছিল ব্রাহ্মণ্যভাব।